আক্রান্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম একত্র প্রকাশ :   আষাঢ়, ১৩৭০

প্রকাশক :

মৈনাক বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

অজয় বর্ধন

দীপ্তি প্রিন্টার্স

৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ :   প্রণবেশ মাইতি

আক্রান্ত

রবি লোকটা আসলে ডিফেনসের খেলোয়াড়। সর্বদাই নিজের দুর্গ সামলাচ্ছে, বিপক্ষের আক্রমণ রুখতে হিমসিম খাচ্ছে। কখন গোল খেয়ে যায় তার তো ঠিক নেই। কদাচিৎ অ্যাটাকে উঠে এসে সে যদি কখনো এক আধটা গোল করেও ফেলে তবু ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই। নিশ্চিতভাবেই ও নিজের এলাকায় পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। একদিন এইভাবেই হয়তো ও নিজের গোলে ঢুকে যাবে। তারপর জড়িয়ে পড়বে নিজেরই জালে।

অনেকের ডাক ও পোশাকী দুটো আলাদা নাম থাকে। রবির পোশাকী নাম হতে পারত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তা হয়নি। রবির কোনো পোশাকী নাম নেই। তার নাম একটাই। রবি সর্বজ্ঞ। নামটা হালকা পলকা হলেও তার পদবীটি ভারিক্কী। পদবীতেই তার পুষিয়ে গেছে। রবির অল্পেই পুষিয়ে যায়।

যতদূর জানা যায়, মাত্র দশ মাস বয়েসে সে হাঁটতে শিখেছিল। এক বছর বয়েসে সে কথা বলত। ক্লাস থ্রীতে একবার সে অঙ্কে পেয়েছিল একশয় একশ। অনেক ভেবেচিন্তেও রবি নিজের আর কোনো কৃতিত্বের কথা মনে করতে পারে না। তবে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় ইস্কুলের স্পোর্টসে থ্রী লেগড রেস-এ সে সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়েছিল বটে। কিন্তু সেই দৌড়ে তার পার্টনার বিশুই তাকে শেষ গজ তিনেক ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পায়ে এত ব্যথা পেয়েছিল সে যে, চোখে লাল নীল তারা দেখেছিল কিছুক্ষণ। সেই প্রাইজ পাওয়ার ঘটনাটাকে কৃতিত্বের মধ্যে ধরবে কিনা তা নিয়ে দীর্ঘকাল সে দ্বিধায় আছে। আর কেউ না জানুক, রবি নিজে জানে,

বিশুর দুর্দান্ত গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে শেষ সীমার কাছাকাছি গিয়ে সে পড়ে যায়। বিশু তাকে ঝটকা মেরে তোলে এবং টানতে টানতে নিয়ে শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। রবি সেই থেকেই জানে, ডিফেনসিভ লোকের কখনো কোনো অ্যাটাকিং লোকের সঙ্গে জোড় বাঁধা উচিত নয়।

ডিফেনসে খেলার নিয়মগুলি রবি শিখে গেছে এবং মোটামুটি মেনেও চলে। সে কদাচিৎ লোককে চটায়। পৃথিবীর কোনো বিষয় সম্পর্কে সে নিজস্ব কোনো মতামত পোষণ করে না। অধিকাংশ মানুষকেই সে নিজের চেয়ে উন্নততর জীব মনে করে।

দেবতারা গ্রহান্তরের মানুষ কিনা তা রবি জানে না। তবে সে জানে এই গ্রহেই বহু দেবতার মতো মানুষ বাস করে। পৃথিবীটা তারাই চালাচ্ছে। তারাই দুনিয়ার মালিক। রবির মতো কিছু বহিরাগতকে এখানে খুব লজ্জার সঙ্গে অধোবদনে এবং প্রায় আত্মগোপন করে বসবাস করতে হয়।

রবি সেইভাবেই বসবাস করে। অনধিকারীর মতো।

আপনারা যাঁরা বাইরে থেকে রবি সর্বজ্ঞকে দেখেন তাঁরা তার ভিতরটা দেখতে পান না। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের হেলপ করতে পারি। রবিকে বাইরে থেকে যতটা অপদার্থ মনে হয় আসলে সে তার চেয়েও অনেক বেশী অপদার্থ। অনেক অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যালোচনার পর আমার মনে হয়েছে, রবির ভিতরটা অনেকটা চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো। একধারে গভীর অতল হতাশার খাদ, তার পাশেই আবার উত্তুঙ্গ উচ্চাশার পর্বত। তার মানসিকতা খুবই এবড়ো খেবড়ো সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলোর বাড়াবাড়ি। আবার কোথাও ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

রবি সর্বজ্ঞকে যে এত ভাল চিনি তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিই রবি সর্বজ্ঞ। রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে এই নিকটতম আত্মীয়তায় আমি মোটেই খুশি নই। লোকটাকে আমি সব সময়ে সহ্যও করতে পারি

না। তবু শয়নে স্বপনে জাগরণে এবং আমৃত্যু রবির সঙ্গে আমার আর ছাড়ান কাটান হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু মুস্কিল হল, আমার নাম রবি সর্বজ্ঞ হলেও আমি পুরোপুরি রবি সর্বজ্ঞ নই। কোথায় যেন, কীভাবে যেন রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার একটু পার্থক্য আছে। রবি যখন খুবই বোকার মতো অজায়গায় কোনো কথা বলে ফেলে তখন আমি লজ্জায় জিব কাটি। এমন মেরুদণ্ডহীন আচরণ সে মাঝে মাঝে করে যে, আমার তাকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। তার ব্যক্তিত্বহীন ডিফেনসের খেলা দেখে মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে আমি চোখ বুজে থাকি। আমার বিশ্বাস মাতৃগর্ভে রবি এবং আমি দুটি যমজ শিশু হিসেবে প্রবৃষ্ট হই। কিন্তু কোনো ঘটনাক্রমে সেই যমজ শিশু-দুটি একাকার হয়ে গিয়ে একটি শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ফলে বাইরে থেকে রবিকে একজন বলে মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তা নয়। গবেষকরা কী বলবেন জানি না, কিন্তু এই বিশ্বাস আমার এতই দৃঢ় যে, আমি নিজের একটা আলাদা নাম রাখব কিনা তা ভাবছি। কিন্তু সে নামের কথা থাক।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি, রবি সর্বজ্ঞ একটু অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। লাটুবাবুকে একটা জরুরী কথা জানাতে হবে। রবি তাই এক পাঞ্জাবী রেস্টুরেণ্ট থেকে লাটুবাবুকে টেলিফোন করছিল। দিব্যি রিং-এর শব্দ শুনতে পেল রবি। লাটুবাবুও ফোন ধরতে দেরী করলেন না। বললেন, হ্যালো।

আজ্ঞে, আমি রবি বলছি।

সাগ্রহে লাটুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বলছ? বলো বলো।

এই অবধি হওয়ার পরই কাউনটারের পাঞ্জাবী লোকটা খট করে রিসিভারের বোতাম চেপে লাইনটা কেটে দিল। এবং বিনা দ্বিধায় রবির হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিতে নিতে বলল, আরে ছোড়ো ছোড়ো। আভি কাম কা টাইম মে—

কথাটা শেষ না করেই পাঞ্জাবী লোকটা ডায়াল করতে শুরু

করল। তার মুখটা খুবই রাগী-রাগী, চোখ দুটোয় সাংঘাতিক দৃষ্টি। সবুজ পাগড়ি থেকে চুমকির আলো ঠিকরে আসছে।

লোকটার নিশ্চয়ই ফোন করাটা জরুরী দরকার। কিন্তু জরুরী দরকার রবিরও। লাটুবাবু সকাল থেকে বসে আছে।

পাঞ্জাবী লোকটা মেশিনগান চালানোর মতো হুড়োহুড়ি কথা বলছে টেলিফোনে। তারপর ঝড়াক করে লাইন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করতে শুরু করল।

রবি যথেষ্ট অপমান বোধ করছে। তার মনে হচ্ছে, এই অভদ্র ব্যবহারের জবাবে তার একটা কিছু করা উচিত। অন্তত ভদ্রভাবে একটা প্রতিবাদ। তাছাড়া সে লাটুবাবুর লাইন পেয়েছিল, সুতরাং পাঞ্জাবী লোকটা তার কাছে পয়সা চাইতেও পারে।

রবি ক্ষীণ স্বরে বলল, দেখিয়ে—

লোকটা শুনতে পেল না বা শুনল না ইচ্ছে করেই।

রবি এবার একটু উঁচু স্বরে বলল, দেখিয়ে পাঁয়জী—

এবার লোকটা রবিকে দেখল। কানে ফোন ধরা অন্যমনস্কতায় ডান হাতটা নেড়ে বলল, আভি যাও-যাও—

রবি স্পষ্টই বুঝতে পারলো, লোকটা অ্যাটাকের খেলোয়াড়। তাছাড়া পাঞ্জাবীরা বীরের জাত। টেলিফোনটাও তো ওরই। ও যদি তাকে ফোন করতে না দেয় তাহলে কী করার আছে তার? অর্থাৎ সোজা কথা, রবি প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছিল এবং এইসব নীতিকথা ভেবে নিজের কাপুরুষতাকে নিজের কাছে ঢাকবার চেষ্টা করছিল। তবে ভিতরে ভিতরে সে জানে, তেমন তেমন লোক হলে তার হাত থেকে পাঞ্জাবী লোকটা এত সহজে ফোন কেড়ে নিতে পারত না। নিলেও পার পেত না।

দোকান থেকে নেমে আসতে আসতে রবি প্রায় ফিস ফিস করে বলল, দেখিয়ে পাঁয়জী, এ-কাম ঠিক নেহি হ্যায়।

পাঞ্জাবীটা অবশ্য কথাটা শুনতে পেল না।

অথচ আমি জানি, রবির উচিত ছিল পাঞ্জাবীটা যখন ডায়াল করছিল তখন খুব সাহসের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বোতাম টিপে ওর লাইনটাও কেটে দেওয়া এবং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা, পাঁয়জী, কাজটা তুমি ঠিক করোনি।

কিন্তু রবির দ্বারা সে কাজ হওয়ার নয়। আর ঠিক এই কারণেই রবির সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না।

লাটুবাবু বসে আছে। ভ্রূ কোঁচকানো। মুখটায় বিরক্তির তিতকুটে ভাব। বাঁ হাতের দু আঙুলে বাঁ গালের একটা আঁচিলকে ডাইনে বাঁয়ে মোচড়াচ্ছে। দৃশ্যটা স্পষ্ট মনশ্চক্ষে দেখতে পায় রবি। ফোনটা তাড়াতাড়ি করা দরকার।

অবশেষে একটা ওষুধের দোকান থেকে লাটুবাবুকে ফোন করতে পারল রবি।

লাটুবাবু, আমি রবি।

লাটুবাবু খেঁকিয়ে ওঠে, আগের বারে লাইনটা কেটে গেল কেন বলো তো!

ফোনের কি কিছু ঠিক আছে লাটুবাবু?

লাটুবাবু তার পরেও গজ গজ করে, সেই থেকে বসে আছি হাঁ করে! যাক গে তাড়াতাড়ি বলো, আবার না লাইন কেটে যায়। গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। ছেলেটা ওই কোম্পানিতেই কাজ করে।

সে আমি জানি।

দু' হাজার টাকার মতো মাইনে পায়।

ঠিকমতো খোঁজ নিয়েছো তো?

নিয়েছি।

চরিত্র-টরিত্র কেমন?

যারা দু' হাজার টাকা মাইনে পায় তাদের অধিকাংশেরই চরিত্র ভাল হওয়ার কথা নয় লাটুবাবু।

তার মানে কি ?

মানে চরিত্র তেমন সুবিধের নয়।

তুমি কার কাছে খোঁজ নিয়েছিলে ?

একজন কেরাণীর কাছে।

কেন; কেরাণীর কাছে কেন ? সোজা কোনো সাহেবের ঘরে ঢুকতে পারলে না ?

সাহেবরা আমাকে ইনফরমেশন দেবে কেন ?

আ মোলো। যাকগে, তা সেই কেরাণী তোমাকে কী বলল ?

বলল, রুদ্রাক্ষ সেন দেদার ঘুঁষ খায়।

আঃ আস্তে! ফোনে নামটামগুলো বলার দরকার নেই। শুধু "ছেলেটা" বললেই হবে। ঘুঁষ খায় বলল ?

হ্যাঁ।

সে না হয় হল। কিন্তু চরিত্র কেমন ?

ঘুঁষ খেলে আর চরিত্রের থাকে কি ?

ঘুঁষের সঙ্গে চরিত্রের কী সম্পর্ক ? বলি মেয়েছেলের দোষ আছে কি না, মদ খায় কি না সে-সব খোঁজ নিয়েছিলে ?

নিয়েছি। কিন্তু কেরাণীটা আর কিছু বলতে পারেনি। শুধু বলল, মেয়েছেলের দোষ কি আর নেই মশাই, অত টাকা লুটছে, সেটা ওড়াচ্ছে কোথায় ?

সঞ্চয়ও করতে পারে তো!

তা পারে।

খোঁজ নাও।

আরো খোঁজ নেবো লাটুবাবু ? তাতে যদি আরো খারাপ কিছু বেরোয় ?

আরো খারাপের কথা উঠছে কেন ? এখনো তো খারাপ কিছুই বেরোয়নি।

ঘুঁষটা তাহলে ধরছেন না ?

ঘুঁষ? ওঃ, তোমার মাথাটাই গেছে। ঘুঁষ আবার কি? ছুটো পয়সা রোজগার করছে, সেটাও ধরতে হবে নাকি? চোর-ডাকাত তো আর নয়। ও ব্যাপারটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শুধু খোঁজ নাও, চরিত্রটা কেমন।

রবির হঠাৎ মনে হল, ঘুঁষের কথায় লাটুবাবু রাগ করেছেন। সুতরাং একটু প্রলেপ দেওয়া দরকার। সে তাই বলল, আসলে কী জানেন লাটুবাবু, ঘুঁষ জিনিসটা যে দোষের নয় তা আমিও জানি। কিন্তু আমি ভাবলাম আপনি তো মর‍্যালিস্ট মানুষ, হয়তো পছন্দ করবেন না।

পছন্দ করিও না। বুঝলে! যাকে সত্যিকারের ঘুঁষ বলে তাকে আমি পছন্দ করিও না। তবে লোকের উপরি কাজ করে দিয়ে উপরি কিছু পাওয়াটা তো আর তেমন দোষের নয়।

তা তো নিশ্চয়ই।

তাহলে আর সেটাকে ঘুঁষ বলছ কেন? ঘুঁষ নয়, ছুটো পয়সা আসছে আর কি। দেখ গে, হয়তো সেই টাকায় সঞ্চয় করছে। তাতে সরকারের লাভ হচ্ছে, দেশের ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগছে। টাকাটা যদি খারাপ টাকাই হত তাহলে সরকার বেয়ারার বণ্ড বেচে সেই টাকা নিজের কাজে লাগানোর কথা ভাবত না। টাকার গায়ে ভাল বা খারাপ বলে কিছু লেখা থাকে না হে।

রবির কাছে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয়ে যায়। ঘুঁষ বা কালো টাকা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত না থাকায়, লাটুবাবুর কথায় সায় দিতে তার অসুবিধে হয় না তেমন। উপরন্তু লাটুবাবুর কথায় প্রতিবাদ করা বা অন্য কোন ভাবে তাকে চটিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। তাই রবি খুব বিনীতভাবে বলল, সে তো ঠিকই লাটুবাবু।

তাহলে? বারবার ঘুঁষ ঘুঁষ করছ কেন? বরং একটু খোঁজ নাও, ছোকরার চরিত্র কেমন।

নেবো। আপনি ভাববেন না। বলে বিনীতভাবে টেলিফোনটা রেখে দেয় রবি।

আমার বাবা আশুতোষ সর্বজ্ঞ মদের ব্যবসা-পছন্দ করতেন না। কিন্তু ব্যবসাটা ছিল আমাদের বংশগত। বাবা উত্তরাধিকারসূত্রে পান। কথায় বলে "গয়লা মদ খায়, শুঁড়ি খায় দুধ।" আশুতোষ সর্বজ্ঞ অবশ্য যেমন দুধ খেতেন তেমনি আবার আফিংও খেতেন। তবে সে নেশা তাঁর ইচ্ছাকৃত হয়। প্রৌঢ় বয়সে একবার তাঁর এমন পেট খারাপ হয়েছিল যে, কোনো ওষুধে, ডাক্তারেই তা ধরল না। ধাত ছাড়ার উপক্রম। সেই সময়ে আমাদের নিয়তিকাকা এসে পরামর্শ দেন, আফিং ধরো হে, আফিং ধরো। কাল দিয়ে কালরোগ ঠেকাও।

আশুতোষ সর্বজ্ঞ আফিং ধরতে রাজি ছিলেন না। জীবনে তিনি বিড়ি সিগারেটও খাননি। কিন্তু নিয়তিকাকা রোজ আসতেন এবং রোজই এক কথা আউড়ে যেতেন, কাল দিয়ে কালরোগ ঠেকাও হে। আগে তো জান বাঁচাও, পরে মান।

অবশেষে বাবা আফিং ধরেন এবং কী আশ্চর্য, তাঁর পেট ভালও হয়ে যায়। সেই থেকে নিয়তিকাকা বাবার একজন প্রধান পরামর্শ-দাতা হয়ে ওঠেন। যদিও এই লোকটা সম্পর্কে আমার মার কিছু সন্দেহ ছিল। নিয়তিকাকার নাম কস্মিনকালেও নিয়তি নয়। সবাই জানত, তিনি হলেন কালীবাবু। শোভাবাজারের বনেদী ক্ষয়িষ্ণু এক বেনে পরিবারের উত্তরপুরুষ। পরনে শীতে গ্রীষ্মে একটা গলাবন্ধ ধূসর রঙের সুতীর কোট, তলার দিকে ধুতি মোজা ও পাম্প শু। মাথায় কাঁচা পাকা চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে পাট করে আঁচড়ানো। একেবারে উনিশ শতকের চেহারা। কলকাতার প্রায় সব শুঁড়িকেই চিনতেন। বাবার সঙ্গে খাতির কিছু বেশী ছিল। একসময়ে বিলিতি হুইস্কি দিয়ে নেশা শুরু করেছিলেন, পয়সার অভাবে দেশী হুইস্কিতে নামেন, শেষ বয়সে বাংলাতেও অরুচি ছিল না। মার সন্দেহ ছিল, বড়লোকদের ডোবাতে যেমন প্রায় সময়েই একটি কুপরামর্শদাতা শনিঠাকুর এসে হাজির হয় এই কালীবাবু লোকটিও তাই। আফিং ধরিয়েছে, এর পর চণ্ডু ধরাবে। তাই কালীবাবুর

কথা উঠলেই মা বলত, ও হচ্ছে ওঁর নিয়তি। সেই থেকে কালীবাবুকে আমরা নিয়তিকাকা বলেই উল্লেখ করতাম।

পুরোপুরি নিয়তি না হলেও কালীকাকা খানিকটা নিয়তির কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই। নানারকম ব্যবসায় মাথা এবং টাকা খাটিয়ে তিনি কখনো লাভ করতেন বা লোকসান দিতেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লাভ বা লোকসান কোনোটাতেই থিতু হতে পারেননি। চুনের ব্যবসায়ে লাভ করে নুনের ব্যবসায় লোকসান দেওয়াটা ছিল তাঁর অবধারিত। কথা উঠলে বলতেন, ওঠাপড়াই ভাল, তাতে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায় না। জ্যান্ত আছি যে, তা বেশ টের পাই।

আমাদের বাড়িতে মদ দূরের কথা, মদের খালি শিশিটাও কখনো ঢোকেনি। সেই বাড়ির বৈঠকখানা অবধি মদ ঢুকিয়ে ছেড়েছিলেন কালীকাকা। প্রথম প্রথম বাবা প্রবল আপত্তি করেছিলেন। তারপর কালীকাকা তাঁকে বোঝাতে থাকেন যে, বৈঠকখানা হল অন্দর ও বাহিরের মিলনস্থল। এটি কেবল গৃহস্বামীর একক অধিকারের জায়গা নয়, অতিথিদেরও কিছু অধিকার আছে। তবু বাবা প্রবল আপত্তি বহাল রাখায় একদিন কেঁদে ফেলে বললেন, তোর লক্ষ্মীমন্ত মুখখানা রোজ দেখতে আসি রে আশু। তাও কি তোর সহ্য হয় না। তিন পুরুষের অভ্যেস, সন্ধ্যের পর এ না হলে শরীর এলিয়ে পড়ে, চোখের তারা শিবনেত্র হয়ে লালনীল হলুদ ফুল দেখতে থাকি। এ তো আর নোংরা মাতালদের ন্যাস্টি নেশা নয়। এ-হল বংশের ধারা। এসে কোণের দিকে বসব, আলোটা না হয় কমিয়ে রাখিস, একটু আড়াল হয়ে মাঝে মাঝে চুক করে একটা চুমুক মেরে নেবো। এতে তোর সতীত্ব যায় কিসে ? বলতে বলতে কালীকাকা একদিন বাবার পারমিশন পেলেন। পকেটে জবাকুসুমের একটি শিশিতে ভরা জিনিসটি থাকত। আড়াল করেই খেতেন।

বলতে নেই মদের ব্যবসায় আমাদের কিছু বোল বোলাও ছিল। কিন্তু কালীকাকা বলতেন, এ হল বসা ব্যবসা। নড়াচড়া নেই,

ওঠাপড়া নেই, উত্তেজনা নেই, হারজিৎ নেই, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। একে কি ব্যবসা বলে নাকি? এই বসা ব্যবসা করতে করতে তুইও শালগ্রামশিলা হয়ে যাচ্ছিস রে আশু। তুমি শালগ্রামশিলা, ওঠা বসা যার সকলই সমান তারে লয়ে রাসলীলা।

বাবা রেগে গিয়ে বলতেন, তা কী করতে হবে? তোমার মতো পাথর ভাঙার কল করতে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বাঁধা রাখব নাকি?

বাস্তবিকই সেই বছর নলহাটিতে কালীকাকার পাথর ভাঙা কল লাটে উঠেছিল।

কালীকাকা সুর পাল্টে বললেন, তোকে অত অ্যাডভেনচারাস হতে বলিনা। কিন্তু এ তো চাকরির মতো বাঁধা আয়ে বাঁধা পড়ে গেছিস। ব্যবসা বাড়ছে না, ছড়াচ্ছে না, ফুলে ফেঁপে উঠছে না। মাড়োয়াড়িদের দেখ, গুজরাটিদের দেখ, লাখ টাকার ব্যবসা দু' লাখে দাঁড়াচ্ছে। দু' লাখ থেকে চার লাখে উঠে যাচ্ছে। সবদিকে চোখ, সব দিকে হাত। ফিলম, স্মাগলিং, ড্রাগ কোনোটা বাদ দিচ্ছে না। এক ফ্যামিলিতে চার ভাই তো চারটে ব্যবসা। আর তোর কী হবে? একটা ব্যবসা টিক টিক করে চলছে। তুই ফৌত হলে ছেলেরা একটা মরা গরুর ওপর চারটে শকুনের মতো হামলে এসে পড়বে। ছেঁড়া-ছেঁড়ি, ভাগা ভাগি। যাও টিকে ছিল, ভাগাভাগির ঠেলায় লাটে উঠবে। তাই বলি ছেলেদের নামে নামে আরও তিনটে দিক খুলে দে। মদ ছাড়াও পয়সা কামাইয়ের পথ আছে।

কালীকাকার কথায় আমল দেওয়ার মানেই হয় না। বাবাও দিতেন না। কিন্তু কালীকাকার স্বভাব ছিল, একটা কথা রোজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। নানান সুরে বলতে বলতে একসময়ে সেটা বিশ্বাসযোগ্যও হয়ে উঠত। ভেবে দেখলে, প্রস্তাবটা তেমন অন্যায্যও নয়। বাঙালীর পারিবারিক ব্যবসা ভাগাভাগির ঠেলায় লাটে ওঠে, এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং বাবাও ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবটির সারবত্তা বুঝতে পারলেন।

অলক্ষ্যে শয়তানের বাজনা বেজে উঠল। পিশাচ পেত্নী উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগল। নিয়তির মুখে ফুটল মুচকি হাসি। মায়ের লক্ষ্মীর পটে একটা কালো মাকড়সা হেঁটে গেল একদিন।

আশু সর্বজ্ঞের সব ছেলেই তখন ধরতে গেলে নাবালক। মদের ব্যবসার বাইরে অন্য কোনও ব্যবসা সম্পর্কে আশু সর্বজ্ঞেরও কোনো ধারণা ছিল না। কাজেই অভিজ্ঞ অংশীদার জুটিয়ে আনলো কালীকাকা।

দু বছরের মাথায় প্রথম চোট হল ট্রানসপোরট বিজনেস। আমাদের দু দুটো লরি যে এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কোন গহীন লরির অরণ্যে হারিয়ে গেল তা কে বলবে? যথেষ্ট তদবিরের অভাবে ইনসিওরেনসের টাকাটা পর্যন্ত পাওয়া গেলনা। বেলেঘাটায় ইলেকট্রিক বালব তৈরির কারখানাটায় রোজ হামলা করত স্থানীয় মস্তানরা। চাঁদা দাও, চাকরি দাও। শেষতক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় বাবার একটা স্ট্রোক হল। কারখানা জলের দরে কিনে নিল আর একজন। বাবা হয়তো সেই দরে বেচতেন না, কিন্তু মা তখন পারলে ঘরের টাকা দিয়ে অপয়া কারখানাটা অন্যকে গছান। ভিন্ন পন্থায় বেহাত হল বালিগঞ্জে বার কাম চীনে রেস্টুরেণ্ট। সেটাকে সাজাতে গোছাতে বিস্তর টাকা ঢালতে হয়েছিল। চীনে রাঁধুনীকে ভাল মাইনেও দিতে হত। পরে জানা গিয়েছিল সে ব্যাটাচ্ছেলে জাতে চীনে হলেও পেশায় ছিল মুচি। রান্না জানত লবডঙ্কা। তবে সেই রেস্টুরেণ্টে গায়িকা এবং নর্তকী ছিল। আমি দুজনকেই দেখেছি। নর্তকীটি বিশাল। তার সবই বিশাল। পশ্চাদ্দেশ, বক্ষদেশ, মুখমণ্ডল। রেস্টুরেণ্টে যে কাঠের ড্যানসিং ফ্লোর তৈরি করা হয়েছিল তাতে মচাক মচাক শব্দ উঠত নাচের সময়। ক্যাবারে নাচের সেই প্রাণান্তকর প্রোটোটাইপ যথেষ্ট মাতাল না হলে উপভোগ করা অসম্ভব। কিন্তু মাতাল হওয়াও বড় সহজ ছিল না। সেই দোকানের পার্টনার বিশুবাবু তাড়াতাড়ি লাভের মুখ দেখতে মদের বোতলে প্রচুর জল মেশাতেন।

ফলে লোকের নেশা হতনা। তবে যে মেয়েটি গান গাইত তার কিছু এলেম ছিল। গরীব ঘরের কলেজে পড়ুয়া মেয়েটির বিষণ্ণ গলায় গান একটা ব্যাপ্তি লাভ করত। কিন্তু রেস্টুরেন্টকে তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় করার জন্য দিশিবিলিতি নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আমদানি হওয়ায় মেয়েটির গলা চাপা পড়ে যায়। এ সব সত্ত্বেও দোকানটা হয়তো চলত। মুশকিল হল লোকেশন নিয়ে। যে-পাড়ায় দোকান সে পাড়াটা ভদ্রপল্লী। সুতরাং একদিন গণ-দরখাস্ত গেল কর্তৃপক্ষের কাছে, অসহ্য গণ্ডগোল, অসভ্যতা, নোংরামি ভদ্রপল্লীকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে। দোকান অতএব উঠল। আমরা বসলাম। প্রায় পথেই :

লাটুবাবুর ব্যবসা ছিল ফিলম। ডিসট্রিবিউটার। ব্যবসাটা টিম টিম করে চলছিল। দপ্ করে জ্বলে ওঠা দরকার। তার জন্য টাকা চাই। আমাদের মদের ব্যবসার কাঁচা টাকা পেয়ে ব্যবসাটা একটু বেশীই দপ্ করে থাকবে। অকস্মাৎ আমাদের অখ্যাত বাড়িতে ফিলমের বিখ্যাত কয়েকজন লোকের যাতায়াত দেখা গেল। একজন সহ নায়ক এবং এক চরিত্রাভিনেত্রীও পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। আমরা জাতে উঠে গেলাম আর কী। স্টুডিও-পাড়ায় নিত্যি বারোমাস নানা ছবির মহরৎ হচ্ছে। তার কোনোটা সিকি ভাগ, কোনোটা অর্ধেক, কোনোটা বারো আনা উঠে বন্ধ হয়ে যায়। এরকম মরুপথে হারানো ধারার বিস্তর ফিলম এখনো হিমঘরে পচছে। লাটুবাবু এরকম দুখানা অসমাপ্ত ছবি শেষ করে জনসমুদ্রে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা ছবির নায়ক পরলোকে, ডামি দিয়ে কাজ চালানো হল। আর একটা ছবির কাহিনীর শেষাংশটা লেখা ছিল না। সেটাও লাটুবাবু লিখলেন। দুটো ছবিই এক এক সপ্তাহের জন্য মুক্তি পেয়ে ফের হিমঘরে ফিরে গেল। লাগলে আমরা লাল হয়ে যেতাম। তবে লাগল না।

তবু লাটুবাবুই একমাত্র লোক যিনি ঋণটা স্বীকার করলেন।

বাবাকে বললেন, চুক্তিমতো আপনারও যা গেছে আমারও তা গেছে। কেউ কারোটা ধারিনা। তবু চল্লিশ হাজার টাকার ধার আমি মেনে নিচ্ছি। টাকাটা দেবো। তবে ধীরে ধীরে। খুব ধীরে ধীরে।

তিনি কথা রেখেছেন। ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে শোধ দিচ্ছেনও বটে। না দিলেও বলার কিছু ছিল না।

এই ফিল্মের ব্যবসাটা ছিল আমার নামে। ফলে লাটুবাবুকে নিরন্তর তাগাদা দিয়ে আদায় উশুল করার অনন্ত দায়িত্বও আমার ওপর অর্শাল। বলতে নেই, এই যৌবন বয়সে এখন সেটাই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান মামলোত। একমাসে লাটুবাবু তিনশো টাকা যদি দেন তাহলে পরের ছ মাস চুপ করে থাকেন। তারপর হয়তো পর পর তিন মাস একশ করে দিলেন। তার পরের দু মাস চুপ। আবার দুম করে একদিন হয়তো পঞ্চাশ টাকার বোমা ফাটান। কিন্তু অতি বৃহৎ বিস্ফোরণ কদাচ ঘটে না। ফলে চল্লিশ হাজার টাকা এখনো টেনেমেনেও পঁয়ত্রিশে নামেনি। তবু লাটুবাবুর কাছে আমাকে প্রায় রোজ যাতায়াত বজায় রাখতে হয়। টাকা দিচ্ছেন, সুতরাং তিনি আমার সঙ্গে উত্তমর্ণের মতোই ব্যবহার করেন। তাঁর বিস্তর ফাই ফরমাশও আমাকে খেটে দিতে হয়। আমি খাটিও। না, কথাটা ভুল বলা হল। আমি খাটিনা, খাটে রবি সর্বজ্ঞ। ওই ব্যক্তিত্বহীন, ঘিন-ঘিনে, অমেরুদণ্ডী রবি। তার ধারণা, এটা লাটুবাবুর ঋণ শোধ নয়, অহৈতুকি দয়া। এমন কি লাটুবাবুর যাতে উন্নতি হয় লাটুবাবু যাতে ঠিকঠাক পাওনা গণ্ডা আদায় করতে পারেন তার জন্যও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে রবি। তার ধারণা, লাটুবাবুর হাতে প্রচুর টাকাকড়ি এলে তিনি আশু সর্বজ্ঞর ঋণ আরও বেশী বেশী এবং ঘন ঘন শোধ করবেন। তখন প্রতি মাসেই বড় বড় বিস্ফোরণ ঘটবে। হাজার দু হাজার করে।

আজকাল রবি টাকার ব্যাপারে লাটুবাবুর সঙ্গে সাংকেতিক ভাষা-তেই কথা বলে। তার তাগাদা দেওয়ার ধরনটা হল, লাটুবাবু, এবার একটা ফাটান। অনেকদিন কোনো আওয়াজ নেই।

লাটুবাবুও ওই ভাষাতেই বললেন, বারুদ কোথায় হে যে ফাটাবো ? ছ দিন রোসো, ফাটবে। ভেবো না, আমি হচ্ছি এক কথার মানুষ। একবার যখন বলেছি যে শোধ দেবো, তখন ঠিকই দেবো। কড়ায় গণ্ডায়। এখন বারুদ নেই।

রবি খুব লজ্জার সঙ্গে মাথা চুলকে বলে, সে তো ঠিকই। আজকাল কারুর কাছেই বারুদ নেই। তবে এখন একটা ছোটোখাটো ফাটলে আমার একটু সুবিধে হত।

লাটুবাবু সেদিন তাঁর বৈঠকখানায় নতুন ক্যালেণ্ডার লাগাবেন বলে রবিকে দিয়ে পেরেক পোঁতাচ্ছিলেন দেওয়ালে। যে টুলটার ওপর দাঁড়িয়ে রবি পেরেক পুঁতছিল সেটা প্রচণ্ডরকমের নড়বড়ে। হাতুড়ির বদলে একটা ভাঙা নোড়ার আধখানা দিয়ে পেরেক ঠুকতে হচ্ছিল রবিকে। দেয়ালের চুনবালি খসে খসে পড়ছিল তার চোখে মুখে গায়ে। লাটুবাবু নিচে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, ফাটবে হে, ফাটবে। আগে সেজো মেয়ের বিয়েটা দিই। তারপর দেখো, ছোটো-খাটো নয়, একদম অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে দেবো।

একথা শুনে রবির হাত থেকে শিবের ছবিওলা ক্যালেণ্ডারটা খসে মেঝেয় পড়ে গেল। লাটুবাবুর যে আরও বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে এটা তার জানা ছিল না। থাকলে তারই সমূহ বিপদ। মাত্র বছর খানেক আগে আর এক মেয়ের বিয়ে দিলেন লাটুবাবু। সেই বিয়ের দোহাই দিয়ে মাস ছয় উপুড়হস্ত করেননি।

মুশকিল হল লাটুবাবুর এই দুর্গে বৈঠকখানায় বেশী অনুপ্রবেশ করতে পারেনি রবি। রবি কেন, কেউই পারেনি। বৈঠকখানার পিছন-দিকে ভিতরবাড়িতে যাওয়ার যে দরজা আছে তাতে অত্যন্ত মোটা কাপড়ের রন্ধ্র বা ফাঁক-ফোঁকরহীন একটা পর্দা ঝোলে। অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য দরজার মজবুত কপাট প্রায় সব সময়েই ভেজানো থাকে। সেই রহস্যময় রূপকথার অন্দরমহলে লাটুবাবুর যে সব আত্মীয়-পরিজন আছে তাদের কোনোদিন চোখে দেখেনি সে। এমন

কি তাদের কণ্ঠস্বরও বৈঠকখানায় পৌঁছোয় না কখনো। তবে খুব কদাচিৎ সেই কপাটে একটু-আধটু করাঘাত ও চুড়ির ঠিন ঠিন বেজে উঠতে শুনেছে রবি। সেই শব্দ শুনে লাটুবাবু উঠে পর্দার আড়ালে চলে যান। ফিসফিস একটু আধটু কথাবার্তা বলে আবার ফিরে আসেন। ব্যস, এই পর্যন্ত।

শিবের ক্যালেণ্ডারটা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে লাটুবাবু আবার রবির হাতে দিলেন। বললেন, আবার ফেলোনা কিন্তু। সময়টা আমার ভাল যাচ্ছে না। ঠাকুর দেবতার অপমান হলে ফের কুপিত হয়ে বসবেন।

রবি ক্যালেণ্ডারটা পেরেকে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল। লাটুবাবু আর একটা পেরেক এগিয়ে দিলেন। বাঁ দিকের দেওয়ালে এবার কালীর ক্যালেণ্ডারটা লাগাতে হবে।

রবি নড়বড়ে টুলটায় সাবধানে উঠে সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনার কয় ছেলেমেয়ে লাটুবাবু?

লাটুবাবু এই প্রশ্ন শুনে একটু বিরক্ত হন। অন্দরমহলের খবর বড় একটা শোনাতে চাননা কাউকে। একটু বিরস গলায় বললেন, ছেলে আর হল কোথায়? মাগীটা অপয়া, বুঝলে! কেবল মেয়ে বিয়োলো সারা জন্ম। অল লায়াবিলিটিজ, নো অ্যাসেট।

সন্দেহটা ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল রবির। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম রেখে সে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আপনার আর কয় মেয়ে বিয়ের বাকি?

রবির সমস্যাটা লাটুবাবু বোঝেন। তাই খানিকটা সান্ত্বনার গলায় বললেন, আর মোটে দুজন। ভেবো না, চটপট হয়ে যাবে। সেজো-জনের জন্য এক ভাল ছেলের খোঁজ পেয়েছি। কথাবার্তাও শুরু হয়েছে। এখন আর একটু খোঁজ খবর নেওয়া বাকি।

রবি কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ রেখে জিজ্ঞেস করে, পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়েছে?

লাটুবাবু সান্ত্বনার গলায় বলেন, না, দেখাদেখির স্টেজ এখনো

আসেনি। পাকা খোঁজ খবর না নিয়ে দেখানোটা ঠিকও নয়। আমাদের পরিবারে বেশী দেখাদেখির নিয়মও নেই কিনা।

ও। রবি খুব হতাশ হয়। মেয়েটার বিয়ের যত দেরী হবে তত তাকে লেজে খেলাবেন লাটুবাবু। কাজেই মেয়েটার যত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় ততই ভাল। তাতে লাটুবাবুরও উপকার। রবিরও।

সবশেষে বুদ্ধদেবের ছবিওলা ক্যালেণ্ডারটা ঝুলিয়ে দিয়ে রবি নিজের গরজেই বলল, ঠিক আছে। ছেলেটা সম্পর্কে কী খোঁজখবর করতে হবে বলুন। আমিই খোঁজ নেবো।

একথা শুনে লাটুবাবু একটু উজ্জ্বল হলেন। বললেন, নেবে? বাঁচি তাহলে। বড় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। শুনেছি, ছেলেটা একসেপশনাল। শুধু চরিত্রটা যদি ভাল হয় তাহলে আর চিন্তার কিছু থাকে না।

রবির আজকাল বাস্তববোধ বেড়েছে। বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, ছেলে তো ভাল,কিন্তু আপনার মেয়ে কেমন?

এবার লাটুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, বাপ হয়ে নিজের মুখে আর কী বলব। তবে আমার ছোটো ভায়রা ওকে প্রথমে দেখেই বলেছিল, এ যে ঝিলিক! সেই থেকে আমার সেজো মেয়ের নামই হয়ে গেল ঝিলিক।

রবি একথাতেও খুব ভরসা পেলনা। বাপেরা বাড়িয়ে বলেই। উপরন্তু এই কট্টর পর্দানশীন বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া হওয়ার কথা নয়। সে বলল, রূপটাই তো বড় কথা নয়। একসেপশনাল ছেলেরা পাত্রীর অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটাও চায়।

লাটুবাবু গদগদ হয়ে বললেন, ঝিলিকের তাও ফেলনা নয়। কলকাতার ছেলেরা সুন্দর মেয়ে দেখলেই পিছুতে লাগে বলে একটু ডাগরডোগর হয়ে উঠতেই আমি ওকে ওর পিসির বাড়ি নাগপুরে পাঠিয়ে দিই। সেখান থেকেই বি-এ পাশ করে এসেছে। মেয়ে আমার সবদিক দিয়েই ভাল। কিন্তু ছেলেটি শুনেছি, বড় বেশী

একসেপশনাল। যদি এ বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারো রবি, তাহলে এই বলে রাখলাম, তোমাকে আমি থোক হাজার টাকা দেবো।

রবি খুবই চমকে উঠল। তার হৃদপিণ্ড ধকধক করতে লাগল। মুখে দেখা দিল রক্তোচ্ছ্বাস। তবু নিজেকে সামাল রেখে সে এই পরিস্থিতিতে একটু ব্যবসা-বুদ্ধি খাটাল। বলল, মোটে!

এমন অভিমান ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল যে, লাটুবাবু ফের লজ্জা পেয়ে বললেন, আচ্ছা, দু হাজার!

রাহাখরচ বাবদ লাটুবাবু নগদ দশটা টাকাও দিলেন।

॥ দুই ॥

রবির সঙ্গে যে আমার নিরন্তর বনিবনার অভাব তার আর একটা কারণ, রবির ওই ভেজা ন্যাতার মতো চরিত্র। সে কানে শুনল যে, ঝিলিক সুন্দরী এবং বি-এ পাশ, তবু তার মনের মধ্যে কোনও ভুড়ভুড়ি- কাটল না, দোলা লাগল না। পুরো ব্যাপারটাকেই সে একটি অর্থ- নৈতিক দিক থেকে বিচার করতে লাগল। ঝিলিকের এই জায়গায় বিয়ে হলে সে লাটুবাবুর কাছ থেকে দু হাজার টাকা পাবে। ফালতু টাকাও নয়, তার বাবার দেওয়া দাদনেরই খানিকটা। তবু তার চতুর্থ শ্রেণীর মানসিকতা সেই সম্ভাব্য টাকার চারদিকেই চক্কর খেতে লাগল। যেন বা সে লটারিই পাবে।

এমন নয় যে, রবি পুরুষত্বহীন। আবার এমনও নয় যে, সে সাধু চরিত্রের লোক। তবু এই ভরা যৌবনবয়সেও রবি যে যুবতীদের কথা ভাবে না, তার কারণ, ভাবার মতো জোর পায়না সে। রবি ধরেই নিয়েছে, তার চাকরি বাকরি ব্যবসা বা বিয়ে কিছুই হবে না। বিশ্বভরা যুবতীদেরও সে তাই গ্রহান্তরের মানুষ বলে মনে করে। যে সমস্যাট যখন রবির সামনে আসে তখন সে সেইটে নিয়েই এত বেশী ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, জীবনের অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো তার মনে স্থান পায় না। তাই ঝিলিকের চেয়েও ঝিলিকের বিয়ে এবং লাটুবাবুর দু হাজার টাকা তার কাছে এখন অনেক বেশী গুরুতর। সে তাই নিয়ে ভাবতে লাগল।

নিয়মিত দাড়ি কামালে এবং পরিষ্কার ইস্তিরি করা পোশাক পরলে রবিকে খারাপ দেখানোর কথা নয়। তাদের পরিবারের সুন্দর বলে খ্যাতি আছে। কিন্তু নিজের এই দিকটা সম্পর্কে সে কদাচিৎ সচেতন

সর্বদাই নানা রকম ভয় ভীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে থাকে সে। দাড়িটা কামানো বা ফর্সা পোশাকটা পরার প্রয়োজনই সে অনুভব করে না। যৌবনবয়সেই জীবনের এইসব বাহুল্য সম্পর্কে সে উদাসীন হয়ে গেছে। উত্তর কলকাতার একটি কো-এডুকেশন কলেজে পড়ার সময় তার ওই উলোঝুলো পোশাক, না কামানো দাড়ি ও না আঁচড়ানো চুলের জন্য সহপাঠী ও সহপাঠিনীরা তার নাম দিয়েছিল বোমভোলা। কলেজের ক্লাসে রবি বসত পিছনের বেনচে। একটু জড়োসড়ো থাকত। প্রত্যেকের প্রতিই শ্রদ্ধাভীতি প্রদর্শনের জন্য ছাত্র ও ছাত্রীমহলে তার জনপ্রিয়তা ছিল। সবাই রবিকে পছন্দ করত। কারো সঙ্গেই তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা ছিল না। কি করে থাকবে? মেধাবী ছাত্র বা সুন্দরী ছাত্রীরা সবাই যে গ্রহান্তরের মানুষ। আর বেশীরভাগই অ্যাটাকের খেলোয়াড়।

তার ক্লাশে অন্তত পাঁচজন সুন্দরী মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে জনা তিনেক দুর্দান্ত সুন্দরী। দুর্দান্তদের একজন রেশমী বসু। তার গায়ের চামড়ার নিচে কী কৌশলে যে ঈশ্বর ফ্লুরেসেণ্ট আলো ফিট করেছিলেন তা কে জানে! কিন্তু সেই ল্যাম্প আলো দিত। আর ওই মুখখানা কুঁদে তৈরি করতে ব্রহ্মার বিস্তর মেহনত গেছে, সন্দেহ নেই। রেশমী গড়পরতা বাঙালির সৌন্দর্যবোধের চরমসীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সুন্দরী মেয়েরা বোকা হয় বলে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। রেশমীর মধ্যে বোকামি, মেয়েলিপনা, সংকোচ বা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। সব ছেলের সঙ্গেই সে হৈ-হুল্লোড় করত। এমন কি রবির সঙ্গেও। রবি তার দিকে তাকাত ঠিকই, কিন্তু তার বুকে কখনো সুড়সুড়ি উঠত না। মুখে দেখা দিত না রক্তোচ্ছ্বাস। আসলে সেই সময়েই কালীকাকার পরামর্শে চার রকম ব্যবসায় টাকা ঢেলে তাদের একের পর এক ভরাডুবি ঘটছে। তারা গরীব থেকে গরীবতর হয়ে যাচ্ছে। আশুতোষ সর্বজ্ঞর স্ট্রোক হল সেই সময়ে। আর ঠিক সেই

সময়েই লাটুবাবু হিমঘর থেকে উদ্ধার করা অসমাপ্ত ফিলম "প্রিয়ার মন" শেষ করে তিনটে হলে রিলিজ করলেন।

ঘটনাটি ঘটল এই "প্রিয়ার মন" দেখতে গিয়েই। ফিলমের ব্যবসায় তার নামে টাকা ঢালা হয়েছে, সুতরাং রবির উদ্বেগ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু "প্রিয়ার মনে"র পিছনে তাদের অবদান কতটা তা সে কাউকেই বলেনি।

সেদিন দারুণ বৃষ্টি। রবি ভিজে ভিজে একহাঁটু জল ভেঙে কলেজে গিয়ে দেখল, কলেজ প্রায় ভোঁ-ভাঁ। প্রফেসরদের ঘর খাঁ খাঁ করছে। দু-চারটি ভেজা ছেলেমেয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে হা-হা হি-হি করে যাচ্ছে। রবিকে দেখে তারা সোল্লাসে চেঁচাল, বোমভোলানাথ আজ আসবেই আমরা জানতুম! ও তো টেরই পায় না কখন বৃষ্টি নামল বা রোদ উঠল।

রবি অর্থাৎ আমি একটু লজ্জা পেলাম। কথাটা মিথ্যেও নয়। "প্রিয়ার মন" আমাকে এতই উদ্বিগ্ন রেখেছে যে, ছাতাটা পর্যন্ত নিয়ে বেরোতে মনে ছিল না। যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড় অবধি এসেছি তখন বাড়ির ঠিকে ঝি ছুটে এসে ছাতা দিয়ে গেল।

দু চারটে ছেলেমেয়ের মধ্যে সেদিন রেশমীও ছিল। আর সেদিন রেশমী ঠিক অন্য দিনের মতো উচ্ছল ছিল না। কেমন যেন একটু উচাটন হাবভাব। আমাকে দেখে কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমার গালে সেদিন প্রায় দিন সাতেকের বাসি দাড়ি। গায়ে একটা আধময়লা আধভেজা বোতামহীন ডোরাকাটা শার্ট এবং মোটা ধুতি। পায়ে ঠনঠনের সস্তা চপ্পল। ভিজেটিজে সেদিন বোধ হয় শ্রী আরো খোলতাই হয়েছিল।

কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পরই একে একে সবাই কেটে পড়তে লাগল। বৃষ্টির তোড়ও কমে এল ধীরে ধীরে। শেষ অবধি রয়ে গেলাম আমি আর রেশমী। ঠিক রয়ে গেলাম নয়। রেশমী আমাকে চোখের ঠারে থেকে যেতে ইংগিত করেছিল। কেন, কে জানে।

হয়তো নোট-টোট টুকে দিতে বলতে বা রিকসা ডেকে দিতে ফরমাস করবে। রেশমীর ছোটোখাটো ফরমাস আমি খেটেছিও।

সবাই চলে যাওয়ার পর রেশমী সেদিন বলল, চলো, বৃষ্টি থেমেছে। তুজনে আজ একটু ইচ্ছেমতো ঘুরি।

ঘুরবে? রাস্তায় যে হাঁটুজল!

রেশমী তার দীঘল চোখে ছদ্ম বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলল, তুমি বুঝি জল-কাদাকে ভয় পাও?

নাঃ। আসলে তোমার কথা ভেবে বলছিলাম আর কি। যা দামী শাড়ি পরেছো একখানা, নষ্ট করবে।

তোমার সঙ্গে আজ আমার সিরিয়াস একটা কথা আছে রবি। আজকের মতো দিন আর পাবো না। চলো।

আমার সঙ্গে কারো সিরিয়াস কথা থাকতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তবু বললাম, কোথায় যাবে?

সেটা বাইরে বেরিয়ে ঠিক করব। চলো, আজ অনেক কথা বলব তোমার সঙ্গে।

আমি অর্থাৎ রবির এইসব সাংকেতিক কথায় তেমন কিছু মনে হল না। একবারও সে ভাবল না, রেশমী হৃদয়ঘটিত কোনো বন্ধনে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাইছে। বরং সে ভাবল, রেশমী আজ তাকে নিশ্চয়ই তার লেটেস্ট প্রেমের ঘটনাটা শোনাবে, যা রবিকে প্রায়ই অন্যান্য মেয়েদের কাছে শুনতে হয়।

তুজনে বেরোলো এবং জলকাদা ভেঙে শ্যামবাজার মুখো হাঁটা দিল। হাঁটতে হাঁটতে বাস্তবিকই রেশমী গুনগুন করে মেলা কথা বলছিল। আবোল তাবোল কথাই। রবিকে বার তুই জিজ্ঞেস করল, তার বাড়িতে কে কে আছে। তার ভাইবোনরা কীরকম। তারা কি খুব ধর্মভীরু? খুব রক্ষণশীল?

রাস্তায় সেদিন সারি সারি ট্রাম থেমে আছে। ট্রামের জটে থেমে আছে বাস ট্যাকসি ও প্রাইভেট কার। রাস্তায় তেমন লোক নেই।

আকাশে আরো ঘনঘোর মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। চড় বড় করে বৃষ্টিও শুরু হল হঠাৎ।

তুজনে দৌড়ে গিয়ে যে সিনেমাহলের লবিতে উঠল, আশ্চর্য! আশ্চর্য! সেইটেতেই চলছিল "প্রিয়ার মন"।

লবি একদম ফাঁকা। রবি খুবই অবাক হয়ে দেখল, টিকিটের কাউন্টারে একটি লোকও নেই। একটা ভোমা মাছি এ কাউন্টার থেকে ও কাউন্টারে উড়ে উড়ে বসছে। বুকিং ক্লার্ক ঢুলছিল বসে বসে। রবি শুনেছিল, ছবিটা তেমন চলছেনা। কিন্তু এতটাই যে চলছেনা তা তার ধারণা ছিলনা। প্রিয়ার মন তাকে এত উদ্বিগ্ন করে তুলল যে, লক্ষ্যাই করলনা বৃষ্টির জন্য মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে যে ঘোমটাটি দিয়েছিল রেশমী, সেই ঘোমটা এখনো নামায়নি। এবং রেশমী রবির দিকে চেয়ে মৃত্ব ও ইংগিতপূর্ণ একটা রহস্যময় হাসি হাসছিল।

রবিকে গাড়ল বললে প্রকৃত গাড়লদেরও অবমাননা হয় তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবু রবিকে আমি ততটা দোষ দিইনা। রেশমী যে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এটা মনে করার মতো কোনো কারণও তার ছিল না। গ্রহান্তরের মানুষেরা গ্রহান্তরের মানুষকেই প্রশ্রয় দেবে এটাই তো স্বাভাবিক। রবির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কিসের?

হঠাৎ রেশমীই বলল, ছবিটা দেখবে?

রবি "প্রিয়ার মন" একবার দেখেছে। খুবই কষ্ট হয়েছে দেখতে। এক সময়ে তো তার মনে হচ্ছিল, সীটটা পর্যন্ত তাকে ঠেলা দিয়ে বলছে, বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, খামোখা জগদ্দলের মতো বসে থেকোনা। মানুষের অনেক কাজ থাকে।

রবি তাই নাকটা কুঁচকে বলল, ছবিটা বোধহয় ভাল নয়।

রেশমী হেসে ফেলে বলে, বোকা! ছবি আমরা দেখব নাকি? আমরা তো বসে গল্প করব। খারাপ ছবি হলে হল ফাঁকা থাকবে, তাতে আমাদের আরো সুবিধে।

অগত্যা টিকিট কাটা হল। ভিতরে ঢুকে রবি আঁৎকে উঠে দেখল,

সারি সারি মুণ্ডহীন সিট। যেন একপাল কবন্ধ মরা চোখে চেয়ে আছে পর্দার দিকে। গাটা একটু ছমছম করে উঠল তার। রেশমীর হাত চেপে ধরে সভয়ে সে বলে উঠল, চলো চলে যাই।

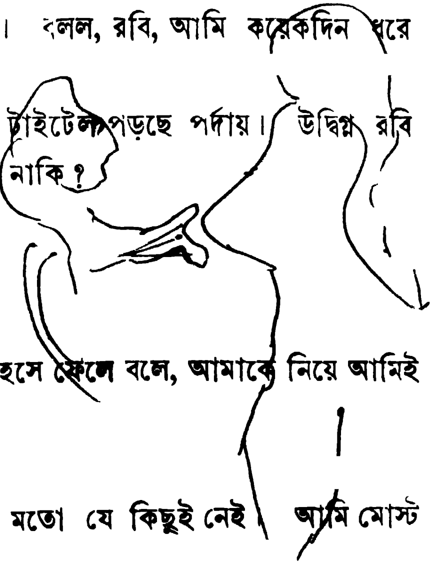
রেশমী হাত ছাড়িয়ে নিলনা। তার মুখে সুগন্ধী একটা শ্বাস ফেলে বলল, এরকমই তো চাইছিলাম। এসো বসি।

সিট দেখানোর লোককে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল রবি। অন্ধকার থেকে একটা গমগমে গলা ভেসে এল, যেখানে খুশি বসে যান। কোনো অসুবিধে নেই।

খুব পিছনের দিকে তারা বসল। না, হল একদম ফাঁকা নয়। বসার পর রবি দেখল, সামনের দিকে সস্তার সিটে কিছু লোক আছে। সংখ্যায় তারা নগণ্যই। তবু আছে।

রেশমীর হাত রবি ছেড়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। বসবার পর রেশমী আবার রবির হাত ধরল। বলল, রবি, আমি কয়েকদিন ধরে একটা কথা ভাবছি।

নিউজরিল শেষ হয়ে ছবির টাইটেল পড়ছে পর্দায়। উদ্বিগ্ন রবি একটা ঢোঁক গিলে বলল, তাই নাকি?



কী ভাবছি জানো?

কী বলো তো!

তোমাকে।

আমাকে! বিস্মিত রবি হেসে ফেলে বলে, আমাকে নিয়ে আমিই ভাবি না।

কেন ভাবো না?

আমাকে নিয়ে ভাববার মতো যে কিছুই নেই। আমি মোস্ট আনইণ্টারেস্টিং।

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে রেশমী বলে, তোমাকে একথা কে বলেছে?

কেউ বলেনি। আমি জানি।

ছাই জানো।

চড়া মিউজিক দিয়ে টাইটেল শেষ হল। একটা ছাদের দৃশ্য। একটি মেয়ে এলোচুলে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছে। আলোর ব্যবহার দেখে মনে হয়, দিনের বেলাই হবে। মেয়েটা যথেষ্ট ভাল দেখতে। জল দিতে দিতে হঠাৎ সে কী ভেবে একটা সূর্যমুখীর টবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ফুলের সঙ্গে গাল ছোঁয়াল। তারপরই তেড়েমেড়ে উঠে ঘুরে ঘুরে গান ধরল "মোর হৃদয়ে লাগল দোলা, লাগল দোলা…।" দৃশ্যটা কেটে ক্যামেরা গিয়ে ধরল একটা মেসবাড়ির অভ্যন্তরকে। কয়েকজন যুবক জানালায় ভীড় করে কিছু একটা দেখছে। আসলে দেখছে মেয়েটাকেই। ঘরের অন্যধারে চৌকির ওপর বিছানায় বসে তরুণ নায়ক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করে যাচ্ছে চোখ বুজে "রে গা সা…রে গা সা…" আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। জানালা থেকে একজন তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "সুবীর, কী জিনিস রে! দেখলি না তো! ওফ।" সুবীর একটু বিরক্তির ভাব ফোটাল মুখে, কিন্তু তার "রে গা সা" অব্যাহত চলতে লাগল। আবার মেয়েটার দৃশ্য। চটুল সুরে মেয়েটা গেয়ে যাচ্ছে "এ মন ঝিনুক যদি হয়, আর প্রেম যদি মুক্তোর মতো, তাহলে কী হয়…তাহলে কী হয়… সেই প্রেম কোনোদিন যায় না ভোলা, যায় না ভোলা…মোর হৃদয়ে লাগল দোলা…।" মাঝে মাঝে নায়কের "রে গা সা" পাঞ্চ হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দৃশ্যটায় অবিরল একবার ছাদ ও একবার মেসবাড়ি এবং দোলা ও রে-গা-সায় ঝুলতে লাগল। রবি কিছুতেই বুঝতে পারছিলনা, ছবিটার দোষটা কোথায় হচ্ছে। কিন্তু দোষ যে একটা হচ্ছে তা টের পাচ্ছিল সে।

হঠাৎ সে হাতে চিমটি খেয়ে চমকে উঠে বলল, কিছু বলছ?

অনেকক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি। কী দেখছ অমন হাঁ করে?

রবি বিরস মুখে বলে, ছবিটা জমছে না, না?

না জমুক, আমাদের তাতে কী? পাশে কোনো মহিলা থাকলে ওরকম অন্যমনস্ক হতে নেই, তাতে মহিলাটি জেলাসি ফিল করতে পারে।

ওঃ, জেলাসি। জেলাসির কী আছে তোমার?

পর্দার মেয়েটা কি আমার চেয়ে সুন্দর?

মোটেই না।

তাহলে অমন হাঁ করে তাকিও না।

কিন্তু না তাকিয়েই বা রবি থাকে কী করে? এই ছবিটা তাদের পয়মন্ত মদের ব্যবসার একটা মোটা টাকা টেনে নিয়েছে। ওই যে মেয়েটি নাচছে ও হচ্ছে ছবির নায়িকা। এই দৃশ্যটা তোলা হয়েছে লাটুবাবুর আগের আমলে। যখন ছবিটা প্রথম তোলা হয়েছিল তখন নায়িকাটি ছিল তন্বী এবং যুবতী। লাটুবাবুর আমলে ছবির বাকি অংশ তোলার সময় নায়িকা আরো নামী, দামী ও মোটা হয়েছে। দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু নাচটাই সব ঢিলে করে দিয়েছে। ওই শরীর নিয়ে কি নাচা যায়?

আবার চিমটি খেয়ে রবি চোখ বুজে বলল, দেখছি না।

দেখছ।

মাইরি না।

তবে আমার কথা কানে যাচ্ছে না কেন?

কী বলছিলে আর একবার বলো।

সব কথা কি দুবার করে বলা যায়?

শুনব কী করে? দু দুটো গান চলছে সাইমালটেনাসলি।

তাতেই তো গোপন কথা বলতে সুবিধে।

রবি অবাক হয়। গোপন কথা! রেশমীর গোপন কথা তাকে কেন?

রবি নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে বলে, এবার বলো।

আমি জানতে চাই তুমি অমন চার্লি চ্যাপলিনের মতো ট্র্যাম্প সেজে থাকো কেন? লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য? তুমি তো আসলে ট্র্যাম্প নও!

রবি চট করে নিজের গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বোকার মতো একটু হেসে বলল, দাড়ির জন্য বলছ?

শুধু দাড়ি বা পোশাক নয়। তোমার কথাবার্তাতেও কনফিডেনসের অভাব। নিজেকে তুমি বড্ড আনইমপরট্যাণ্ট ভাবো।

রবি একথার জবাব খুঁজে পায়না। কারণ পর্দায় তখন নায়ক জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। একা। পিছন থেকে তার পানজাবিতে অনেকখানি ছেঁড়া জায়গা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য। ক্যামেরা গলা বাড়িয়ে নায়িকার বাড়ির জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। নায়িকা ডিভানে বসে একটা ম্যাগাজিন দেখছে। উর্দি পরা বেয়ারা চায়ের ট্রলি নিয়ে ঘরে এসে সেলাম দিল। নায়িকা চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে কব্জির ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ঘরে পিয়ানো আছে, মস্ত রেডিওগ্রাম আছে। অর্থাৎ নায়িকা বড়লোকের মেয়ে। জিনিসগুলো রবির খুবই চেনা। আসলে তাদেরই বাড়ির জিনিস। স্যুটিং করতে নিয়ে গিয়েছিলেন লাটুবাবু। হঠাৎ একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল বাইরে। নায়িকা চমকে হাতের ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে উঠে পড়ল।

পরের সানটা জানে রবি। আনমনে বলে ফেলল, এবার ঝগড়া লাগবে।

ঝগড়া? রেশমী অবাক হয়ে বলল, কিসের ঝগড়া? আমার কথায় তুমি কি রাগ করলে রবি?

রবি বলল, না তো! বাস্তবিকই আমি নিজেকে আনইমপরট্যাণ্ট ভাবি রেশমী।

তবে ঝগড়ার কথা বললে কেন? আমি কি ঝগড়াটি?

রবি মাথা নেড়ে বলল, মোটেই নয়।

তাহলে?

রবি কী করে বোঝাবে যে, সে রেশমীর কথা বলেনি, নায়ক নায়িকার কথা বলেছে। বাস্তবিকই ঝগড়ার আয়োজন হচ্ছিল পর্দায়। নায়িকা একটি আধুনিক যুবকের সঙ্গে মস্ত একটা গাড়িতে করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ দরিদ্র নায়ক মেসবাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিতে

ভিজতে ভিজতে রাস্তা পার হওয়ার জন্য পা বাড়াতেই গাড়িটা ব্রেক কষে। এক ঝলক জল ছিটকে এসে লাগে নায়কের গায়ে। নায়িকা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, চোখে দেখতে পাননা? আর একটু হলেই মরতেন যে। দরিদ্র নায়ক গম্ভীর মুখে বলল, আমাদের মতো লোকের মরাই ভাল। তিলে তিলে মরার চেয়ে আপনাদের দামি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরলে বোধহয় তাড়াতাড়ি স্বর্গে পৌঁছোনো যেত। আচ্ছা, আপনারা খুব বড়লোক, না? লাটুবাবুর নিজের লেখা সংলাপ। তাঁর ধারণা এই ডায়ালগে হাততালি পড়বেই। কিন্তু পড়ল না।

রবি হতাশ গলায় বলল, গরিব বড়লোকের ক্ল্যাশটা আরো খেলিয়ে তুলতে পারলে হত। বলেই খেয়াল হল, কাজটা ঠিক হয়নি। তাই তাড়াতাড়ি অন্য কথায় যাওয়ার জন্য বলল, বুঝলে? ব্যাপারটা কি জানো, তুমি একদম ঝগড়াটি নও। বড়লোকের মেয়েদের যেরকম চড়া মেজাজ থাকে তোমার সেরকম নেই।

রেশমী নূতনতর বিস্ময়ে বলে, তাহলে গরিব বড়লোকের ক্ল্যাশের কথাই বা আসছে কেন? তুমি যতই ক্যামোফ্লেজ করে থাকোনা কেন রবি, আমি জানি তুমিও ভীষণ রিচ ফ্যামিলির ছেলে।

কিন্তু ততক্ষণে উদ্বিগ্ন ও অন্যমনস্ক রবি চোরচোখে পর্দার দিকে তাকিয়েছে। পর্দায় নায়িকা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, অন্তত আপনার মতো ভ্যাগাবণ্ড নই। নায়ক দৃঢ় গলায় বলে উঠল, ঐশ্বর্য আর সম্পদের পাহাড় আপনাদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছে। তাই রাস্তার ভ্যাগাবণ্ডগুলোকে আপনারা দেখেও দেখেন না। ঠিক এই সময়ে স্টীয়ারিং হুইলে বসা নায়িকার প্রেমিক ও এই ছবির প্রতিনায়ক বলে উঠল, ওসব বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলছ কেন রিনি? চলো, পার্টিতে দেরী হয়ে যাবে।

রিচ? রবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা হয়তো একসময়ে রিচ ছিলাম রেশমী। এখন আর নই।

কেন, কী হয়েছে ?

সে অনেক কথা।

রেশমী আবার হাত বাড়িয়ে তার হাত মুঠো করে ধরে বলে, রিচ নাই বা হলে। তুমি যেমনটি আছো চিরকাল তেমনটিই থাকো। তাহলেই হবে।

কী হবে রেশমী ?

একটা কিছু হবে রবি। বড্ড বোকা-বোকা ভান করো তুমি। বুঝতে চাও না।

এতটা সুস্পষ্ট ইংগিতের পরও যে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা তাকে গাড়ল না বলে রবি সর্বজ্ঞ বলাই কি ভাল নয়! আমার তো মনে হয়, কাউকে খুব অপমান করতে হলে তাকে রবি সর্বজ্ঞ বলে অভিহিত করলেই যথেষ্ট অপমান করা হয়। পৃথিবীতে একটা নতুন গালাগাল চালু হোক, রবি সর্বজ্ঞ।

বাস্তবিকই রবি ইংগিতটা ধরতে পারলনা। তার অবশ্য আর একটা কারণও আছে। কী কারণে জানিনা, পর্দার নায়িকা হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে নায়কের গালে একটা চড় কষাল ঠিক সেই সময়ে, যখন রেশমী ওই অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ ও উত্তেজনাকর ইংগিতটি করছিল। রবি মাথা নেড়ে বলল, এরকম থাপ্পড়ের কোনো মানে হয় না। বাড়াবাড়ি।

রেশমী হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খামচে ধরল বুকের জামা। ফোঁপানীর মতো একটা শব্দ করে বলল, তুমি আমার কথা শুনছো না! শুনছো না! কেন ? কেন ? কেন ইমপরট্যানস দিতে চাইছোনা আমাকে ? কেন তুমি এরকম ?

রবির মাথাটা তখন টাল খাচ্ছিল। পর্দার ছবি ও রেশমীর মধ্যে সে কোনো ভারসাম্য আনতে পারছে না। কিন্তু সে হঠাৎ বুঝতে পারছে, রেশমী একটা গভীর কথা বলতে চায়। যে কথা উড়িয়ে দেওয়ার নয়, উপেক্ষা করার নয়। কিন্তু তার মনের ওপর হীনমণ্যতার যে পলিমাটির স্তর তা ভেদ করে রেশমীর পঞ্চশর কিছুতেই বিঁধতে

চাইছিল না। তাই রেশমীর আক্রোশ ও আক্রমণে সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

পর্দায় তখন পারটির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। নায়িকা পিয়ানোয় বসে গান গাইছে। দুঃখেরই গান। তবে মিউজিক বড্ড বেশী চড়া। নায়িকা গাইছে, এই দুনিয়ায় ধনী দরিদ্র বলে কিছু নেই, আছে শুধু মানুষ মানুষ মানুষ···হৃদয়ের চেয়ে টাকা বড় নয়, প্রেম যে সোনার চেয়ে দামী···

রেশমী তার মুখে উপর্যুপরি সুগন্ধী শ্বাস ফেলে বলে, কেন তুমি আমাকে পাত্তা দাওনা ?···আমি কি খারাপ ? বলো···বলো···

রবির মাথাটা তখনো চক্কর দিচ্ছিল। কোনো জবাব আসছিল না মুখে। রেশমীর আক্রমণের ঝাঁঝ একটু কমে এলে সে আস্তে করে বলল, আমি খুব গরিব রেশমী, খুব সামান্য। আমাদের পরিবারের একটা বিরাট অধঃপতন ঘটে যাচ্ছে।···ওই যে দেখ, ওই যে পিয়ানোটা ! ওটা আমাদের। লাটুবাবু শুটিং করতে নিয়ে গিয়ে আর ফেরৎ দেননি। যা কিছু আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসছে না। এই গল্পের শেষটা আমি জানি। ওই পিয়ানোটা বাজিয়েই নায়ক নায়িকা শেষ দৃশ্যে ডুয়েট গাইবে। কিন্তু আমাদের পিয়ানোটা···

বদ্ধ উন্মাদের দিকে মানুষ যেরকম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তেমনি হলঘরের প্রায়ান্ধকারে তার দিকে চেয়ে ছিল রেশমী। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, তুমি ওই ছবিটা দেখছিলে ? আর আমি··· আর আমি যে এতক্ষণ কত আশা নিয়ে···ছিঃ রবি, ছিঃ···

রেশমী ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল তারপর ঘূর্ণী ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল হল থেকে।

আহাম্মক রবি তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু রিফ্লেকস কম বলে বাইরের ভীড়ে আর রেশমীকে খুঁজে পায়নি। কিন্তু তারপর অনেকদিন ধরে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে সে। কী একটা

যেন ঘটতে যাচ্ছিল। হায়, সেটা ঘটলনা। রেশমীকেও পরে বহুবার জিজ্ঞেস করেছে রবি। রেশমী মৃদু হেসে বলেছে, ও কথা থাক। হিপনোটিজমটা কেটে গেছে।

ঘটনার মাত্র আট ন' মাস বাদে, বি এ পরীক্ষার পরই রেশমীর বিয়ে হয়ে যায়। তারও প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন রবি বুঝতে পারে, খুবই প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারে যে, রেশমী একদা তার প্রেমে পড়েছিল। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটার আর কোনো মানে হয় না।

তাই একদিন রবি ব্যস্তসমস্ত হয়ে রেশমীর শ্বশুরবাড়িতে হানা দিল।

রেশমী, তুমি কি আমাকে—মানে আমার প্রেমে পড়েছিলে?

হ্যাঁ গো বুদ্ধ! বুঝতে এতদিন লাগল?

ইস! সেদিন কেন স্পষ্ট করে বলোনি?

যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেছিলাম, যতদূর বেহায়া আর নির্লজ্জ হতে হয় ততদূর হয়েছিলাম। তুমি তবু বুঝলেনা। "প্রিয়ার মন" তোমার মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছিল সেদিন।

রবি ধপাস করে একটা সোফায় বসে নিজের মাথা চেপে ধরল এবং অনেকক্ষণ দুঃখে ও শোকে "উঃ উঃ" করল।

রেশমী নরম গলায় বলল, দুঃখ কোরোনা। ঠিক এইজন্যই বোধহয় তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। তুমি তো ঠিক নরম্যাল ট্র্যাকে চলোনা। বলতে নেই, তোমার প্রতি আমার এখনো বড় মায়া। মাঝে মাঝে ভাবি, আহা রবিটার কী হবে! কে ওকে দেখবে! পৃথিবীতে ওরকম বোকার যে গতি হয় না!

ভাবো! সত্যি ভাবো, না বানিয়ে বলছো!

সত্যিই ভাবি। আমার মতো তোমাকে নিয়ে আর কেউ এত ভাবেনা।

সিঁদুর পরা রেশমীর দিকে চেয়ে রবি বলল, তবে কি আজও—?

রেশমী মৃদু একটু হেসে বলল, খুব সিওর নই। হয়তো—

সেই 'হয়তো' আজও ঝুলছে।

তিন

রবি সর্বজ্ঞর সমগ্র জীবনটাই, অর্থাৎ এই যৌবন বয়স পর্যন্ত, ওই "হয়তো" কথাটার ওপর নির্ভরশীল। সে নিজে কিছুই গড়ে তোলে না, কিছুই ঘটায় না। ঘটনার মাঝখানে মাঝে মাঝে পড়ে যায়। তখন খুবই ঘুরপাক খেতে হয় তাকে। তার বুঝতে দেরি হয়, সিদ্ধান্ত নিতে আরো দেরি হয়।

রুদ্রাক্ষ সেন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পর সাতদিন বাদে লাটুবাবু একদিন বললেন, খবর ভাল নয় হে।

কেন লাটুবাবু?

ছোকরার পরিবার তেমন গা করছে না।

কেন গা করছেনা?

ছোকরার জন্য মোট বারোটা মেয়ে বাছাই করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কেমিক্যাল বায়োলজিস্ট মেয়েও আছে। কানাডায় থাকে।

বলেন কি? রবি যথেষ্ট অবাক হওয়ার চেষ্টা করে।

আর বলি কি? মেয়েরা যে কেন এত বেশী লেখাপড়া শিখতে যায়।

সে তো বটেই। ব্যক্তিত্বহীন রবি অতঃপর বঙ্কিমের একটা কোটেশন হুবহু মুখস্থ বলে লাটুবাবুকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, স্ত্রীলোকের বিদ্যা নারিকেলের মালার মতো। কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিলামনা।

কিন্তু লাটুবাবু সে কথায় কান না দিয়ে বিষণ্ন গলায় বলেন, আমার ঝিলিক আছে বারো নমবরে। কিন্তু অতদূর কি আর গড়াবে?

অন্য পাত্র দেখব ?

আরে দূর ! সে তো উপায় না থাকলে দেখতেই হবে। কিন্তু এ ছোকরা ছিল সত্যিকারের ব্রিলিয়ান্ট। বিয়েটা লাগাতে পারলে জাতে উঠে যেতাম।

রবি একটু ভেবেচিন্তে বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

লাটুবাবু আরো বিষণ্ণ হয়ে বলেন, ওদের খাঁইটাও একটু বেশী। নগদই দশ পনেরো হাজার চায়। তার ওপর সোনা এবং অন্যান্য।

দশ পনেরো ! বলেন কি !

তাতেও আমি রাজি। ঝিলিকের জন্য লাখ টাকার রিস্কও নেবো। কিন্তু বারো নমবর পর্যন্ত কি গড়াবে ? তোমার কি মনে হয় ?

নগদ দশ পনেরো হাজার শুনে রবি সেই ছোকরার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। লাখ টাকার কথা শুনে লাটুবাবুর প্রতিও তার শ্রদ্ধা হতে থাকে। রবি ভেবেচিন্তে বলল, গড়াবে না এমন কথাও বলা যায় না। ওরা হয়তো বারোজনকেই দেখে তারপর সিলেকট করবে।

চিন্তিত লাটুবাবু বললেন, সে তো বুঝলাম। কিন্তু এই বারোজনের কেউই তো ফ্যালনা নয়। সারা দেশ ঢুঁড়ে ছাঁকা ছাঁকা সব মেয়ে বেছেছে। লেখাপড়ায় যেমন, দেখতে শুনতেও তেমন। জনা দুই রেডিওতেও গান টান গায় শুনেছি। ঝিলিক কি ওদের সঙ্গে পারবে ? তোমার কী মনে হয় ?

রবির নাকের ডগায় ঝোলানো দু হাজার টাকার বাণ্ডিলটা দুলতে দুলতে দূরে সরে যেতে থাকে। সে বিরসবদনে বলে, এত কমপিটিটার তা আগে বলতে হয়। আপনার মেয়ে আর সকলের সঙ্গে পারবে কিনা তাই বা বলি কী করে ? আপনার মেয়েকে তো এখনো আমি চোখে দেখিনি।

আহা, একটা আন্দাজ তো করতে পারো, তোমার সিকসথ সেনস্ কাজ করে না ?

রবি একটু রেগে গিয়েই বলে, আমার সিকসথ সেনস্ দু তরফেই মাথা নাড়ে। হ্যাঁও বলে, নাও বলে।

তার মানে?

বলছি তো, আমার সিকসথ সেনস্‌কে বিশ্বাস নেই। আগে বলুন আপনি ম্যাকসিমাম কত টাকা ঢালতে রাজি।

বললাম তো লাখ টাকাতেও পিছোবোনা। কিন্তু তাতে কি! আজকাল লাখ দু লাখ বহুলোকের হাতের ময়লা। ওই বারোজনের বারোটা বাবাই হয়তো বারোজন কোটিপতি।

বাঙালি কোটিপতির সংখ্যা অত হবে না।

তোমাকে বলেছে! লাটুবাবু একটা ধমক দেন, কোটিপতি আজকাল ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশেও পাওয়া যায়। ওটা কোনো ভরসার কথা নয়। ভরসা পাই এমন কথা বলো।

লাখ থেকে কোটির সংখ্যায় পৌঁছে রবির মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করছিল। সে নেশাগ্রস্তের মতো মদির চোখে চেয়ে বলল, আপনি তিন হাজারে উঠুন।

তিন হাজার কী বলছ? বললাম যে লাখেও রাজি! শুধু লাগিয়ে দাও।

না, না। আমি আমার শেয়ারটার কথা বলছিলাম। যদি লাগাতে পারি তাহলে।

ওঃ, তোমার শেয়ার! লাটুবাবু বিস্ময়ভরা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, সেটা কোনো প্রবলেম নয়। আগে লাগাও, তিন কেন পাঁচ দেবো।

দেবেন? আপন গড? রবি উত্তেজনায় প্রায় লাটুবাবুর হাত চেপে ধরেছিল আর কি!

লাটুবাবু চট করে হাত দুখানা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আহা অত ইমোশন্যাল হও কেন? তোমার তো হকের টাকা।

কিন্তু সে কথা ভাবছিলনা রবি। সে ভাবছিল দেশটার কথা। লাখ বা কোটি যখন আর অনেকের কাছেই কোনো সমস্যা নয় তখন

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটা বিপুল উন্নতি ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অঘটন কবে এবং কখন এবং কি ভাবে তার অগোচরে ঘটে গেল তাই সে অবাক হয়ে চিন্তা করছিল। নিজের জীবনে অর্থনৈতিক গতিটা নিম্নগামী হওয়ার দরুনই কি সে সমাজের দেহে এই উন্নতির লক্ষণগুলি ভাল করে লক্ষ্য করেনি?

তাই হবে। আশু সর্বজ্ঞ তাঁর চারটে ব্যবসা চার ছেলের নামে আলাদা করে দিয়ে যান। মরার আগে আর সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ফুরসৎ পাননি। একমাত্র বড় ছেলে মহীতোষ সর্বজ্ঞ লায়েক হয়েছে তখন। তার বিয়েও দিয়েছে। মহীতোষের শ্বশুর বিষয়বুদ্ধিতে পাকা মাথার লোক। নিউ ভেনচার পছন্দ করেন না। তাঁর পরামর্শে মহীতোষ মদের ব্যবসাটা নিজের নামে নিয়েছিল। মদের ব্যবসাটা পুরোপুরি একজনকে দেওয়ার ইচ্ছেও আশুতোষের ছিলনা। কিন্তু তাঁর পড়ন্ত সময়ে ওই বেহাই—অর্থাৎ মহীতোষের শ্বশুর তাঁকে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর পরামর্শের দাম বেড়েছে তখন। তবে মহীতোষকে হাতে ধরে আশুতোষ অনুরোধ করেছিলেন, তোমার ভাইদের যেন ভাত কাপড়ের অভাবটা না হয়। ব্যবসা তোমার নামে আছে থাক, কিন্তু ওদেরও বঞ্চিত কোরোনা।

মহীতোষ বাপের কথাটা রাখেনি। এ ব্যাপারে তার যুক্তি খুব সাদামাটা এবং জোরালো। আশুতোষের মৃত্যুর পর সে তার ভাইদের পরিষ্কার বলে দিল, বাবা তাঁর সব ক্যাপিট্যাল চারভাগে ভাগ করে চারটে ব্যবসাতে লাগিয়েছিলেন। তোমাদের ব্যবসা ফেল করেছে তার জন্য আমি দায়ী নই।

এর ওপর আর কথা চলেনা। ঝগড়াঝাটি অবশ্য বিস্তর হয়েছিল। কিন্তু পৈতৃক এবং বংশগত মদের ব্যবসা মহীতোষের হাতেই চলে গেল। তবু কিছুদিন মহীতোষের সঙ্গে পৈতৃক বাড়িতে একান্নবর্তী থাকতে পেরেছিল তারা। তখনো ভাত কাপড়ের অভাব তেমন দেখা দেয়নি। কিন্তু সে মাত্র বছর দুইয়ের জন্য। তারপরই মহীতোষ পৈতৃক বাড়ি

ভাগাভাগির প্রস্তাব দিল এবং সেই প্রস্তাব কার্যকরও হল। নিজের অংশটা দেয়াল তুলে একদম আলাদা করে নিল মহীতোষ এবং সেই অংশকে ঘষে মেজে সংস্কার করে নিল। চরম উদারতার পরিচয় দিয়ে নিজের মাকেও আশ্রয় দিতে চেয়েছিল সে। তবে সেই প্রস্তাবে মা রাজি হননি। বেঁচেও ছিলেননা বেশী দিন। তখন থেকে যে অর্থনৈতিক অবনতি আরম্ভ হল তার পাল্লায় পড়ে আর রবি চারদিক-কার সমাজব্যবস্থার এই দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করার অবকাশ পায়নি। মেজদা সর্বতোষ কিছুকাল বেকার ও উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করার পর হঠাৎ মধ্যপ্রদেশের এক খনিতে চাকরি পেয়ে চলে যায়। পরের জন অর্থাৎ ছোড়দা যিশুতোষ ভাগ্যদোষে কিছু দুর্বল প্রকৃতির লোক হওয়ায় পরিবারের এই হঠাৎ পতনের ঘটনাটি সহ্য করতে পারেনি। প্রথমদিকে বিড়বিড় করত। তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকতে লাগল। মা মরে যাওয়ার মাস ছয়েক বাদে একদিন ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়ে আর ফিরলনা। মাইল খানেক ভাঁটিতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মহীতোষ খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সর্বতোষের বাড়ির অংশ কিনে নিয়েছিল। যিশুতোষের ওয়ারিশান বলতে তারা তিন ভাই। কিন্তু মহীতোষ রবির দাবির কথা ভুলে গিয়ে যিশুতোষের অংশটাও নিয়ে নিল। রবি এখন সেই বাড়ির পিছনের দিককার দুখানা খুপরি নিয়ে আছে। ঘরগুলো হয়েছিল চাকর বাকরদের থাকার জন্য। বাড়ি ভাগাভাগির সময় মহীতোষ সেই ঘরগুলোরও হিসেব ধরে।

বলা বাহুল্য মহীতোষ অ্যাটাকের খেলোয়াড়। এখন সে নানাভাবে চেষ্টা করছে যাতে রবি বাড়িটা ছেড়ে দেয়। বছর খানেক আগে থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। একদিন মহীতোষ হুট করে এসে ঘরে ঢুকে চারদিক দেখে টেখে নাক কুঁচকে বলল, এঃ এযে একেবারে চাকর বাকরদের ঘর করে তুলেছিস। তা এই এঁদো ঘরে তোর পড়ে থাকার দরকার কী?

রবি সঙ্গে সঙ্গে ডিফেনস নিয়ে বলল, কোথায় যাবো?

মহীতোষ খুব সমবেদনার সঙ্গে বলে, তুই তো আর আমার ফ্যালনা নয়। সামনের দিকে গ্যারেজের ওপরে যে ঘরখানা করেছি সেখানে গিয়ে থাক না। আলো হাওয়া আছে। এ ঘরে বেশীদিন থাকলে যে যক্ষ্মা হয়ে যাবে। বরং এখানে একটা সেলার মতো করা যায়।

সেলার অর্থাৎ মদের গো-ডাউন হোক তাতে রবির আপত্তি নেই। কিন্তু মহীতোষের ওপেনিং গ্যামবিটটা বুঝতে পারছিল না সে। মিনমিন করে সে বলল, এটা তো আমার অংশ, এখানে সেলার হবে কী করে?

মহীতোষ খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোর অংশ তো কী হয়েছে? বরং কয়েক হাজার টাকা দিচ্ছি, লিখে দে। টাকাটা নিয়ে ব্যবসা ট্যবসা করতে পারবি। বসেই তো আছিস।

রবি কথাটায় সায় দেয়নি। না দিয়ে ভালও করেনি খুব একটা।

কয়েকদিনের মধ্যেই মহীতোষ স্ট্র্যাটেজি বদলাল। হঠাৎ একদিন মহীতোষের চাকর এসে ট্রেতে করে কিছু সুস্বাদু খাবার পৌছে দিয়ে গেল রবিকে। বলল, বউদিমণি পাঠিয়েছে।

রবির সন্দেহপ্রবণ মন। মাংসের বাটি থেকে এক টুকরো মাংস এবং একমুঠো ফ্রায়েড রাইস নিয়ে সে আগে একটা কাককে খাওয়াল। দেখল, কাকটা মরে কিনা। মরল না দেখে খেল। তারপর থেকে প্রায়ই বউদি এটা ওটা পাঠাতে লাগল। ব্যবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ভেবে রবি পাড়া থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চা জোগাড় করে আনে। আগে তাকে খাওয়ায়, প্রতিক্রিয়া দেখে, তারপর নিজে খায়।

ক'দিন পর মহীতোষ নিজে এসে বলে, তুই তো একা লোক, দুটো ঘর দিয়ে তোর কী হয়? ও ঘরটা আমি নিচ্ছি। কিছু ভাড়া পাবি।

রবি অ্যাটাকের খেলোয়াড়দের ভয় পায়। প্রথমটায় গাঁইগুঁই করলেও শেষ অবধি রাজি হতে হল। মহীতোষ সে ঘরটায় আলমারি

টালমারি বসিয়ে দিব্যি মদের গো-ডাউন বানিয়ে ফেলল। ভাড়ার অংক কিছু ঠিক হয়নি। তবে মহীতোষ ত্রিশটা করে টাকা দিয়েছিল প্রথম কয়েক মাস। তারপর আর উচ্চবাচ্য করে না।

একদিন রবি মিনমিন করে ভাড়ার কথা তোলায় মহীতোষ বলল, ক' টাকাই বা ভাড়া হয়। তার চেয়ে কিছু থোক টাকা নিয়ে ছেড়ে দে।

রবি জানে, ছেড়ে দিলে সে পথে দাঁড়াবে। সুতরাং ভয়ে সে আর ভাড়ার কথা তোলে না। এখন মদের গো-ডাউন নাকের ডগায় নিয়ে সে থাকে। কিন্তু জানে, বেশীদিন নয়। মদের গো-ডাউন সম্প্রসারিত হয়ে একদিন আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে তার বসবাসের ঘরখানাও কেড়ে নেবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন উঠি উঠি একটা মানসিকতা নিয়ে সে ঘরখানা আঁকড়ে আছে মাত্র।

নিজের অস্তিত্বের এই সংকটই সম্ভবত তাকে এতদিন সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্ধ করে রেখেছিল। লাটুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে এক নতুন চোখে চারদিকটাকে দেখার চেষ্টা করল। তার মনে হচ্ছিল চার দিকটাই লাখোপতি কোটিপতি লোকে গিজগিজ করছে। বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না বটে।

॥ চার ॥

আমার হীনমন্য স্বভাবের দরুন ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমি সহজে মিশতে না পারলেও নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে যায়। নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ মানুষই আমার মতো ডিফেনসের খেলোয়াড়। কোনো অফিসে ঢুকে আমি সাহেব বা বড়বাবুদের কাছে যেতে ভরসা পাইনা। আর্দালি, পিওন বা বড়জোর কেরানীর দ্বারস্থ হই। আমার এই স্বভাবের ফলেই বড়দা'র চাকর রাখালের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

বলতে দ্বিধা নেই তার মালিকের ভাই হওয়া সত্ত্বেও আমাকে রাখাল তার চেয়ে উঁচু শ্রেণীর মানুষ বলে মনে করে না। বোধ করি সেই জন্যই আমার প্রতি সে একটু অনুকম্পাও বোধ করে।

বউদি এখনও খাবার পাঠায়। রোজ না হলেও সপ্তাহে দিন দুই তিন তো বটেই।

সেই খাবার পৌঁছে দিতে আসে রাখাল। বড়দা মহীতোষ যে আমার শত্রুপক্ষ সেটা রাখাল চট করে বুঝে ফেলেছে। খাবার পৌঁছোতে এসে সে তাই দুদণ্ড বসে কথাবার্তা কয়। তার একটা পেটেণ্ট কথা হল, দাদাবাবু, এই শত্রুপুরী ছেড়ে কেটে পড়ো। দুনিয়ায় কি পুরুষমানুষের জায়গার অভাব?

কোনো কোনো পুরুষমানুষের যে দুনিয়ায় সত্যিই জায়গার অভাব এটা আমি তাকে বোঝাতে পারি না।

রাখাল আমার সামনেই বিড়ি ধরায়। তারপর বলে, এমনিতে যদি না যাও তবে অন্যভাবে তোমাকে তাড়াবেই। তোড়জোড় চলছে।

শঙ্কিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, কিসের তোড়জোড় ?

রাখাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বউদি প্রায়ই তারাপীঠে যাচ্ছে। সেখানে এক তান্ত্রিককে ধরেছে। শুনেছি, শবসিদ্ধ তান্ত্রিক। মারণ উচাটন বশীকরণ সব জানে।

অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা গুড়গুড় করে ওঠে। মারণ উচাটন বা মন্ত্রশক্তি আমি মানি বা না মানি ও ব্যাপারগুলো আমার কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, তার কাছে যাচ্ছে কেন ?

মনে হয় তোমার জন্যই একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই তান্ত্রিক গতকালও এসেছিল। খুব একটা ধুম ধাড়াক্কা যজ্ঞ হবে শীগগীরই। আর সেই যজ্ঞে…

সেই যজ্ঞে ? আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, সে আমি অত জানি না। তাই বলছিলাম, নিজের প্রাণটি নিয়ে পালাও। তন্ত্রমন্ত্র বড় সাংঘাতিক জিনিস। আমাদের গাঁয়ের গোবিন্দ তার সৎ ভাই ষষ্ঠীপদকে মারতে এক তান্ত্রিককে লাগিয়েছিল। যজ্ঞের তিন দিনের মধ্যে রক্তবমি করতে করতে ষষ্ঠীপদ পটল তুলল।

বলো কি ? বলে আমি অবসন্ন হয়ে নেতিয়ে পড়তে থাকি। আমার মনের একটা দিকে লজিকের বাস। সে মাথা নেড়ে বলে, ওসব গুল গপ্পো গাঁজা। মারণ উচাটনে যদি মানুষ মারা যেত তাহলে এত ছোরাছুরি বোমা বন্দুকের দরকারই হত না। আমার মনের আর একদিকে বাস করে বুড়ি সংস্কার। সে খোলা গলায় বলে, না বাবা, দুনিয়ায় কত কী হয়! কে অত জেনে বসে আছে ? মন্ত্রতন্ত্রের যে শক্তি নেই তাও তো প্রমাণ হয়নি।

রাখাল ভাবিত মুখে বলে, তান্ত্রিকটাকে দেখলে বাপু ভয় করে। চেহারায় খুব তেজ।

কোনোদিনই আমি মনের ভাব লুকোতে পারি না। কে যেন

বলেছে, মুখ হল মনের আয়না। সে হিসেবে আমার মুখ খুবই উঁচু জাতের আয়না। তাতে আমার মনের ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, এমন কি পেটের ব্যথা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বেগেরও প্রতিক্রিয়া খুবই স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আমার মা বরাবরই আমার মুখ দেখে টের পেত, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে না খিদে পেয়েছে। অভিনেতা বা জুয়াড়ি হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময়। রাখাল আমার মুখের দিকে চেয়ে উৎসুকভাবে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। আমিও বুঝতে পারছি, আমার অভ্যন্তরীণ আতঙ্ক, উদ্বেগ ও দিশাহারা ভাব আমার মুখে রামধনুর রঙ ধরাচ্ছে। যখন মুখ খুললাম তখন আমার কণ্ঠস্বরও চিঁ চিঁ করতে লাগল। বললাম, কিন্তু আমাকে মেরে কী হবে?

রাখাল বিজ্ঞজনের মতো হেসে বলল, তুমি বিদেয় হলেই এই বাড়িখানা পুরোপুরি বাবুর হয়।

আমি চিঁ চিঁ করে বলি, এখনো পুরোপুরিই বাবুর। আমি তো মোটে একখানা ঘরে কোনোরকমে—

একখানা ঘর নিয়ে আছো তো কি? চন্দ্রে গেরোন সূর্যের গেরোন দেখোনি? রাহু একটুখানি লেগে থাকলেও আমরা জলটল খেতে পারি না। তা তুমিই হচ্ছো সেই রাহু। ছাড়ব-ছাড়ব করেও একটুখানি লেগে আছো। কিন্তু বড়বাবু বউঠানকে বলেছে, এ বাড়ি গেরোনমুক্ত করে তবে গঙ্গাস্নান করবে।

আমি অবসাদ ও হতাশায় চোখ বুজে ফেলি। তান্ত্রিকের বান কতদূর কার্যকর তা আমি জানি না। তবে এটা জানি, বানে কাজ না হলে অন্য পন্থারও অভাব হবে না। লড়াইটা বড্ডই অসম। আমি বললাম, তান্ত্রিকের বানের পাল্লা কতদূর জানো? যদি আমি ক'দিন পুরী বা দীঘায় গিয়ে বসে থাকি?

রাখাল হেসে উঠে বলে, সে তুমি বিলেত গিয়ে বসে থাকোনা। এ তো আর গুলতির গুডুল নয় যে, একটুখানি গিয়েই পড়ে যাবে। স্বর্গ

মর্ত্য পাতাল সব জায়গায় ধাওয়া করবে তোমাকে। তবে ঘাবড়িও না, উপায় আছে।

আমি কোনো আশার আলো না দেখেই হতাশ গলায় বললাম, কী উপায়?

যদি চাও তো পাল্টা বান মারবার জন্য আমার গাঁয়ের সেই তান্ত্রিককে আনাতে পারি। তবে দু চারশো টাকা খরচ আছে।

ও বাবা! আমি চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলি, আমার অত টাকা নেই।

তুমি বড্ড কিপটে আছো ছোটোবাবু। খামোখা খাবি খেয়ে মরার চেয়ে দুচারশো টাকাই কি বড় হল? আমি বলি কি, তান্ত্রিকে তান্ত্রিকে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে গোঁফে তা দিতে থাকো। বানে বানে কাটাকাটি হতে থাকবে, তোমার গায়ে আঁচটিও লাগবে না। চাও তো তোমার তান্ত্রিক উল্টো বান মেরে বড়বাবুকেই ঘায়েল করে দেবে।

দু-চারশো টাকা আমি কোথায় পাবো?

কিছু কম করে দেবোখন। এদিক ওদিক চেয়ে রাখাল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে ফেলল খাদে। বলল, তোমার মাথায় ভগবান ঘিলুর বদলে কি গোবর জল পুরে দিয়েছে? টাকার ভাবনা কী গো তোমার? ঘরের লাগোয়া অমন সোনার খনি থাকতে!

আমি ভয় খেয়ে বলি, সোনার খনি! বলো কি?

রাখাল পাশের ঘরটা চোখের ঠারে দেখিয়ে দিয়ে বলল, সোনা নয় তো কী? বোতল বোতল সোনা। তুমি শুঁড়ির ছেলে, তোমাকে মদের দাম শেখাবে কোন শেয়াল? এক আধটা বোতল যদি রোজ হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও তো বেচলে নগদ বিশ পঞ্চাশটা করে টাকা। দু-পাঁচশো রোজগার করতে ক'দিন লাগবে?

এই প্রস্তাবে আমার বুক কাঁপতে থাকে এবং জলতেষ্টা পেয়ে যায়। এরকম অসীম দুঃসাহসিক কাজ আমি জীবনে কখনো করিনি।

বিস্ফারিত চোখে রাখালের মধ্যে এক নররাক্ষসকে দেখতে দেখতে আমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলি, না না না।

রাখাল আমাকে গ্রাহ্য করল না। নিজেই উঠে গিয়ে দু-ঘরের মাঝখানকার পলকা দরজাটা একটু ঠেলেঠুলে দেখে নিয়ে বলল, এ তো ব্যাঙের লাথিও সইতে পারবে না। তোমার ভাগ্য ভাল ছোটোবাবু, পাল্লাটা খোলে তোমার ঘরের দিকেই। ওদিকে খুললে মুস্কিল ছিল, দরজার গায়েই মদের পেটি গাদি করে রাখা। খুব ঠেলে খুলতে হত, শব্দ উঠত। এ একেবারে জলের মতো সোজা কাজ। দেখবে? একটা ইসক্রু ড্রাইভার বা তারের টুকরো যাহোক কিছু দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি তখনো বিকারগ্রস্তের মতো না না না না করে যাচ্ছি। কিন্তু রাখাল লোক চেনে। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। নিজেই খুঁজে পেতে একটা ঝাঁটার কাঠি জোগাড় করে নিয়ে সে দরজার দুই পাল্লা একটু ফাঁক করে নিঃশব্দে কাজ করল কিছুক্ষণ। দু মিনিটের মাথায় দরজা খুলে এল। ওপাশে একটার ওপর একটা প্যাকিং বাক্সের থাক।

রাখাল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, দেখলে?

আমি ভয়ে বাক্যহারা হয়ে যাই।

রাখাল একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ভেড়ুয়া হলে মরতে হয়। অত ভাবছো কেন? এ তোমারও বাবাকেলে ব্যবসা। ইতিবৃত্তান্ত আমি সব জানি। এখান থেকে মাল সরালে তোমার একরত্তি পাপের ভয় নেই। শুধু বেশী লোভ করতে যেও না। একটা দুটোর বেশী বোতল কখনো একবারে বের করো না।

আমার রুদ্ধ কণ্ঠে সামান্য একটু স্বর ফুটল, আমি পারব না।

রাখাল মৃদু ধমকের সুরে বলে, খুব পারবে। বেশী কিছু করতে হবে না। শুধু বের করে আমার হাতে দিও। আমি তোমাকে বিশ পঞ্চাশ করে এনে দেবো খন। আর দরজাটা এদিক থেকে আঁট করে বন্ধ রেখো।

আমি বললাম, পেটির বোতল গোনা গাঁথা থাকে। সরালে ধরতে সময় লাগবে না।

রাখাল মাথা নেড়ে বলল, ওসব ভেবে রেখেছি আমি। গোনা যেমন থাকে তেমনি আবার ভাঙাও যায়। ফাঁকা বোতল আমি ফেরৎ দিয়ে যাবো। সেগুলো একটু ভেঙে আবার পেটিতে রেখে দিও। পেটির খড়ে একটু মাল ঢেলে দিলেই হবে। গুনতিতেও ঠিক থাকবে, তোমার কাজও হাসিল হবে। বড়বাবুর লোকেরা ভাববে, বোতল ভেঙে মাল সব পড়ে গেছে।

আমি ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলাম। হঠাৎ খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

রাখাল বলল, প্রথম প্রথম ওরকম লাগে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ছোটোবাবু। আমি যখন তেঘড়ের উপেন সামন্তকে হেঁসো দিয়ে কাটলাম প্রথমটায় আমারও ওরকম হয়েছিল। সেই প্রথম কিনা। তার পরে আর মানুষ মারতে বুক কাঁপত না। এই তো বছর দুই আগে রসিয়ার চরে গদাইকে বল্লমে গেঁথে এসেই একথালা পান্তা তেঁতুল গোলা দিয়ে মেরে ঢেঁকুর তুলে মাদুরে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি।

এই সংবাদে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবিকই আমার হৃৎস্পন্দন এক আধবার থেমেও গেল। তবু আত্মরক্ষার এক প্রবল তাগিদ অনুভব করে আমি বুক চেপে ধরে উঠে বসলাম। মুখে কথা সরছিল না। হাঁ করে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলাম রাখালের দিকে।

রাখাল স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উদাস হয়ে পড়েছিল। চোখে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। বলল, প্রথমটাতেই যত বাধো-বাধো ঠেকে।

আমি তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি খুন করেছো?

মেলা। হিসেব নেই। বড়বাবু তো সেইজন্যই চাকরি দিয়ে নিয়ে

এল। দেশে খুনী হিসেবে ভাড়া খেটেছি। প্রতি খুন পাঁচশো এক টাকা। বাঁধা রেট। কাজের আগে অর্ধেক আগাম, কাজের পর বাকিটা।

বড়দা তোমাকে এনেছিল কেন? আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

কানে হাত ঠেকিয়ে হাতজোড় করে রাখাল বলল, মিছে কথা বলব না ছোটোবাবু। বড়বাবু আমাকে এনেছিল তোমাদের তিন ভাইয়ের জন্যই। তো এক ভাই পটল তুলল, আর এক ভাই ভেগে পড়ল। তুমি পুঁটিমাছের পরাণটি পড়ে রইলে। নিকেশ অনেক আগেই করতুম, কিন্তু বড়বাবু হিসেবী লোক। আমাকে একদিন বলল, শহুরে খুন একরকম, গেঁয়ো খুন আর এক রকম। তোর তো আবার চাঁড়ালে হাত। এমন মোটা দাগের কাজ করে বসবি যে পরে সব দোষ আমার ঘাড়ে এসে চাপবে। এ কাজে সূক্ষ্ম মাথা আর পরিষ্কার হাত চাই, তা তোর নেই। তুই বরং ক্ষ্যামা দে, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখছি। তা তোমাকে গোপনে গোপনে বলেই রাখি ছোটোবাবু। বড়বাবুর হয়ে তোমাকে খুনটা শেষ পর্যন্ত আমি করতাম না। কারণ এর মধ্যে আমি সেই তান্ত্রিকবাবার কাছে মন্ত্র নিয়ে ফেলেছি। খুন একেবারে বারণ।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বলি, ঠিক বলছো?

ঠিকই বলছি। এখন মশাটা পর্যন্ত মারতে তিনবার ভাবতে হয়, কাজটা পাপ হবে না ন্যায্য হবে।

আমি সন্দিহান হয়ে বলি, খুন বারণ তো তোমার তান্ত্রিক বান মারে কেন?

সে হল মন্ত্র তন্ত্রের ব্যাপার। সরাসরি খুন তো আর নয়। মন্ত্রে যদি মানুষ মরে তবে আমাদের কী করার আছে বলো।

ঠিক কথাই, আমার আর কিছু বলার রইল না।

রাখাল বলল, তাহলে ওই কথাই রইল।

কী কথা রইল তা আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম না।

॥ পাঁচ ॥

লাটুবাবুর মুখ থেকে একদিন দৈববাণী বেরিয়ে এল, ওহে রবি, ইমিডিয়েটলি রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ভাব জমাও। দেরী করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওরা পাঁচ নমবর পর্যন্ত অলরেডি দেখে ফেলেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ভাব জমিয়ে কী করবো ?

আগে তো জমাও। তারপর তোমার থ্রুতে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের একটা আনডারস্ট্যাণ্ডিং তৈরি করা যায় কিনা দেখতে হবে। যা মনে হচ্ছে, ওপেন কমপিটিশনে ঝিলিকের চানস খুব কম। কিন্তু আমি হাল ছাড়ছি না।

রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে হওয়াটা আমারও ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষে লাভজনক। কিন্তু রুদ্রাক্ষের মতো উঁচু জাতের লোকের সঙ্গে ভাব জমানো যে কী শক্ত তা আমিই জানি। কিন্তু লাটুবাবুর যা মানসিক অবস্থা তাতে এসব অসুবিধের কথা বলতে সাহস হল না। উনি প্রচণ্ড টেনশনে আছেন। টেনশন আরো বাড়লে স্ট্রোক ফ্রোক হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সেরকম কিছু হয়ে লাটুবাবু যদি দুনিয়া থেকে হড়কে যান তবে আমার পাওনাগণ্ডা আদায়ের ক্ষীণতম আশার প্রদীপটিও এক ফুৎকারে নিভে যাবে। আমি লাটুবাবুর টেনশন কমানোর জন্য মোলায়েম করে বললাম, ওঃ, এ তো ভাল আইডিয়া।

দশটা টাকা রাহা খরচ নিয়ে আমি হারা-উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার দাড়ি কামানো নেই। জামাকাপড় ময়লা। আর আমার চোখে-মুখে চিরস্থায়ী চোর-চোর জলে-পড়া অসহায় ভাবটি তো আছেই। এ নিয়ে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ভাব জমানো যে কী মুস্কিল। এক

গ্রহের লোকের সঙ্গে অন্য গ্রহের লোকের যেমন অপরিচয়ের দূরত্ব এও তো তাই।

রুদ্রাক্ষের প্রকাণ্ড অফিস-বাড়িটিতে যখন ঢুকলাম তখন বুকটা ধুকধুক করছে। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট আর তেষ্টা। লোকটাকে আমি চিনিনা। কী বলব তাও জানিনা। লোকটা রাগী হলে আমাকে বের করে দেবে। খচ্চড় হলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। গম্ভীর প্রকৃতির হলে কথার জবাব দেবে না। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে।

রুদ্রাক্ষের অফিসে দুটি মহল। একটা দিকে কেরাণী-টেরাণী, অন্য দিকটায় বড় বড় চাকুরেরা। এই দ্বিতীয় মহলটা খুব বেশী চকচকে। কেমন গা ছমছম করে। প্লাইউড আর কাচের তৈরি ঘর। শীততাপনিয়ন্ত্রিত। ঢুকবার মুখেই মেয়ে রিসেপসনিস্ট। আমার মতো লোকের গা ছমছম করারই কথা।

একবার মনে হল, ফিরে যাই। বুকটা বড় বেশী ধুকপুক করছে। পর মুহূর্তেই লাটুবাবুর মুখটা মনে পড়ল। খুব টেনশনে আছে। এই বয়সে এত টেনশন ভাল নয়। লাটুবাবুর দীর্ঘজীবনই আমার কাম্য। আর তাছাড়া অত ভয়ই বা আমার কিসের? বড়দা মহীতোষের তান্ত্রিক যদি বান মেরে আমাকে ফিনিশ করেই দেয় তাহলে দুনিয়ায় আমার ভয় খাওয়ার আর কিছুই থাকতে পারে না। এইসব ভেবে আমি সাহস সঞ্চয় করে রিসেপসনিস্ট-এর কাছে এগিয়ে যাই এবং তার কূট পর্যবেক্ষণের সামনে নিজেকে সংকুচিতভাবে দাঁড় করাই। মেয়েটা আমাকে দেখে তেমন খুশি হয় না। কেমন যেন গড়িমসি করতে থাকে, হাই তোলে একটা, নিজের পালিশ করা নখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। আমার অবশ্য অবহেলা পেয়ে অভ্যেস আছে, তাই তেমন অস্বাভাবিক কিছু লাগে না। এরা অন্য পৃথিবীর লোক। আমি অন্য পৃথিবীর।

অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটি চূড়ান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল এবং সঙ্গত কারণেই ইংরিজিতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ না

করে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

রুদ্রাক্ষ সেন।

বিজনেস?

এই একটু আলাপ করব আর কি।

আপনার নাম?

রবি সর্বজ্ঞ।

উনি খুব বিজি লোক কিন্তু! বলে মেয়েটা আমাকে একটু সাবধান করে দিয়ে ফোন তুলে নেয় এবং রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলে। ফোন নামিয়ে রেখে বলে, ভিতরের দিকে চলে যান। করিডোরে ঢুকে বাঁ দিকের তিন নমবর ঘর।

করিডোরে পা দিয়ে আর একবার আমার মনে হল, ফিরে যাই। রুদ্রাক্ষ সেনের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফের ইচ্ছেটা হয়েছিল। কিন্তু টুল থেকে একটা বেয়ারা উঠে পট করে দরজাটা খুলে দেওয়ায় আমাকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে হল। ফিরে গেলে বাস্তবিকই ভুল করতাম। কারণ রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখলে কিছুতেই রুদ্রাক্ষ সেন বলে মনে হয় না। মনে হয়, লোকটা আমার মতোই একজন ডিফেনসের খেলোয়াড়।

প্রথমে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আমি লোকটাকে খুঁজেই পেলাম না। মেঝে জোড়া নরম সবুজ রঙের একটা গালিচা। মস্ত সেকরেটারিয়েট টেবিল। মস্ত ঘুরন্ত চেয়ার। বড় বড় দেয়ালজোড়া ক্যাবিনেট। তিনটে তিন রঙের টেলিফোন। এ সবের মধ্যে জাঁদরেল রুদ্রাক্ষ সেন কোথায়? আমি অন্তত ছ ফুট উঁচু, পেল্লায়, বৃষস্কন্ধ এক দুর্দান্ত যুবককে আশা করেছিলাম। কিন্তু যে উচ্চতায় রুদ্রাক্ষ সেনের মুখ বা কাঁধ থাকার কথা সেখানে কিছু নেই। আমি আস্তে আস্তে নীচুর দিকে খুঁজতে খুঁজতে অনেকক্ষণ বাদে টেবিল থেকে মাত্র ফুট খানেক উঁচুতে রুদ্রাক্ষ সেনের মুখখানা দেখতে পেলাম। এত নিখুঁত গোলাকার মুখ এবং এত নিখুঁত গোল ফ্রেমের চশমা কদাচিৎ দেখা

যায়। সেই চশমার ভিতরে দু'খানা গোল গোল চোখ আমার দিকে খুবই অসহায়ভাবে চেয়ে আছে। আরো তদন্তে প্রকাশ পেল, রুদ্রাক্ষ সেনের সমস্ত আকৃতির মধ্যেই গোলাকার ব্যাপারটার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তার আঙুলগুলো গোল গোল, কান দুটোও বৃত্তাকার। ভুঁড়ির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। বেশ বেঁটে খাটো, মোটাসোটা ও নিরীহ-দর্শন এই লোকটাকে রুদ্রাক্ষ সেন বললে, রুদ্রাক্ষ সেনের অপমান হওয়ার কথা। এর জন্যই নাকি প্রায় ডজনখানেক বাছাই মেয়ের বাপ বা অভিভাবক হাঁ করে বসে আছে! বিশ্বাস হয় না! বিশ্বাস হয় না!

রুদ্রাক্ষ সেনের চেহারাটা দেখে আমি এতই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই যে অত্যন্ত লঘু গলায় বলে উঠি, হেল্লো মিস্টার সেন।

রুদ্রাক্ষ সেন আমার হাবভাবে নিতান্তই ভয় খেয়ে সিঁটিয়ে যায় যেন। তাকে আরো ছোটো দেখাতে থাকে। চোখগুলো আরো গোল গোল হয়ে ওঠে। মেয়েলী গলায় রুদ্রাক্ষ সেন বলে ওঠে, আপনি কি চান?

বিনা অনুমতিতে আমি তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ি এবং অম্লানবদনে তার মুখের দিকে চেয়ে একটু একটু হাসতে থাকি। হাসির কারণ আর কিছুই নয়, রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, এই তাহলে রুদ্রাক্ষ সেন! অ্যাঁ! এত ছোটোখাটো! এত সামান্য! একে তো আমিও কুস্তি বা দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারি! পাঞ্জা লড়লেও এ কিছুতেই আমার সঙ্গে পারবে না! আমার চেয়ে কত বেঁটে! শুধু রঙটাই যা দারুণ ফর্সা।

এইসব ভাবছি আর ফুড়ুক ফুড়ুক করে আমার হাসি লিক করছে। এতটা অ্যানটি ক্লাইমেকসের জন্য তো তৈরি ছিলাম না। লোকটা যে দেখতেই শুধু ছোটোখাটো এবং নিরীহ তাই নয়, আমাকে দেখে লোকটা ঘাবড়েও গেছে। আমাকে দেখে ঘাবড়ে যায় এমন লোক আমি জীবনে খুব বেশী দেখিনি। তাই যত হাসছি ততই লোকটাকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

রুদ্রাক্ষ সেন যেন একটু হতাশ হয়েই সামনের কাগজপত্রগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনার কি কিছু বলার আছে ?

আমি মাথা নাড়লাম এবং বললাম, আছে।

তাহলে বলে ফেলুন। আমার বেশী সময় নেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বোরডের মিটিং অ্যাটেনড করতে আমাকে চলে যেতে হবে। এই বলে রুদ্রাক্ষ সেন তার হাতের ঘড়িটা দেখল।

আমি লক্ষ্য করলাম রুদ্রাক্ষের ঘড়িটা খুবই দামী চেহারার। বলতে কি, রুদ্রাক্ষের পোশাক-আশাকও খুবই ভাল। কিন্তু তাতে তার পুতুল-পুতুল ভাবটা ঢাকা পড়েনি।

আমি এবার একটু মুস্কিলে পড়লাম। রুদ্রাক্ষের সঙ্গে কী কথা বলে ভাব জমাবো তা আমি ভেবে আসিনি। মাথাটা তাই গুলিয়ে যাচ্ছে। কথাও আসছে না মুখে। সুতরাং অগত্যা আমি তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হেসেই যেতে থাকি। আমার আর কিছুই করার থাকে না।

রুদ্রাক্ষ হতাশভঙ্গীতে আমার দিকে চেয়ে বলে, আপনি ওরকম-ভাবে হাসছেন কেন ? আপনি কি আমাকে চেনেন ?

রুদ্রাক্ষ সেনের হাবভাব দেখে আমার এতই আহ্লাদ হতে থাকে যে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি বেফাঁস বলেই ফেলি, আপনি তো ডিফেনসের খেলোয়াড়।

রুদ্রাক্ষ খুবই অবাক হয়ে যায় এবং অবাক অবস্থাতেই ভ্রু তুলে হেসে বলে, হ্যাঁ, রাইট ব্যাক। আপনি কী করে জানলেন ?

আমি বিজ্ঞের মতো বলি, জানি।

রুদ্রাক্ষ টেবিলের ওপর ঝুঁকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ নোন মি। আপনাকে দেখে আমারও চেনা-চেনা লাগছিল। ঠিক প্লেস করতে পারছিলাম না।

আমি রুদ্রাক্ষের নরম হাতটা ধরে চাপ দিতে দিতেই হঠাৎ টের

পাই, এক দুর্লভ দরজা হঠাৎ আমার সামনে খুলে গেছে। আমি যে অর্থে তাকে ডিফেনসের খেলোয়াড় বলেছি সে সেই অর্থে ধরে নি। লোকটা ফুটবল খেলত। এবং সম্ভবত ফুটবলই তাঁর সবচেয়ে বড় রন্ধ্র। সেই গর্ত দিয়ে আমি এখন ঢুকে যাচ্ছি।

আমি গলায় যথেষ্ট পালিশ এনে বললাম, আপনি চমৎকার খেলতেন। এ রাফ টাফ অ্যাণ্ড অ্যারোগেন্ট ডিফেনডার।

রুদ্রাক্ষ বিগলিত হয়ে বলে, নট রিয়েলি! তবে আমার সাইড দিয়ে গোল কমই হত। বাই দি বাই আপনিও কি ওই কলেজেই...?

কলেজের নামটা উচ্চারণ করার আগেই আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, একই কলেজ।

তাহলে আমারই কনটেমপোরারি! ভেরি গুড। বলতে বলতে এক প্যাকেট দামি সিগারেট ও লাইটার এগিয়ে দেয় রুদ্রাক্ষ, স্মোক?

আমি সিগারেট খাই না। তবু বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলার পক্ষে সুবিধে হতে পারে ভেবে অনভ্যস্ত হাতে একটা ধরিয়ে ফেলি।

রুদ্রাক্ষ বলে, ক্লাবেও আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছিল। দেয়ার ওয়্যার বিগ অফারস। কিন্তু বাবা ডেড এগেনস্টে ছিলেন। বললেন, ক্যারিয়ার আগে, তারপর খেলা। কলেজের পাট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হল বিদেশে। কারটেন অন ফুটবল। তবে আই স্টিল ফিল ফর দি গেম ভেরি মাচ। বাই দি ওয়ে, আপনার নামটা?

রবি সর্বজ্ঞ।

রুদ্রাক্ষ ভ্রু কুঁচকে বলে, এ কুয়্যার সারনেম! সর্বজ্ঞ! তার মানে দি ফেলো হু নোজ এভরিথিং?

আমি খুব অকপট হওয়ার চেষ্টা করে বলি, অনেকেই আমাদের পণ্ডিত বংশ বলে ভাবে। কিন্তু তা নয়। আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস হল মদের।

গুড! ভেরি গুড। রুদ্রাক্ষ মদের ব্যবসা শুনে রীতিমত খুশি

হয়ে বলে, এ গুড বিজনেস। বিদেশে আমি অনেকগুলো ব্রিউয়ারি ভিজিট করেছি। ওঃ, সে যে কী প্রসেস, দেখে মনে হয় এ তো ইনডাসট্রি নয়, আর্ট। আপনাদের কি ব্রিউয়ারি আছে?

না, না। স্রেফ কেনাবেচার ব্যবসা।

তা হোক। ইটস এ নাইস থিং টু বি অলওয়েজ নিয়ার এ সেলার।

আমি সামান্য নাক সিঁটকোই। তার মানে এ লোকটা হয়তো মদও খায়। মদ যে খায় সে লাটুবাবুর চোখে চরিত্রবান পাত্র কিনা তা কে জানে! আমি একটু দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নেশা আছে নাকি?

নেশা! বলে আবার মাছের মতো চোখ গোল করে ফেলে রুদ্রাক্ষ। তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সঙ্গে বলে, না, না, নেশাফেশা আমার নেই। নেশা তো করে বারবারিয়ানরা। আমার ওসব হয় না। আই ক্যান ড্রিংক অ্যাণ্ড ড্রিংক অ্যাণ্ড ড্রিংক অ্যান্ড নাথিং উইল হ্যাপেন। কালই তো ছ পেগ উড়িয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরেছি।

এবার আমি চোখ গোল করে ফেলি। ছ পেগ ওড়াবার পর কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানোর এলেম পুরোনো মাতাল কালীকাকারও ছিল না। রুদ্রাক্ষের শরীরের বাড়তি মেদ কোথা থেকে এসেছে তা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি না চাপতে পেরে বলেই ফেললাম, উরেব্বাস!

বিশ্বাস হচ্ছে না? বলে আহত এক দৃষ্টিতে রুদ্রাক্ষ আমার দিকে চেয়ে বলে, দেখবেন?

আমি ভয় খেয়ে বললাম, না, না তার কোনো দরকার নেই।

রুদ্রাক্ষ টপ করে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না। ঠিক আছে, লেট আস কল ইট এ ডে অ্যাণ্ড স্টার্ট ড্রিংকিং। চলুন।

আমি খুবই বিপাকে পড়ে যাই। মদ খাওয়ার কোনো অভ্যাস আমার নেই। মদ আমরা বেচি বটে, কিন্তু কদাচ খাইনা। তাই খুবই

অসহায়ভাবে বললাম, আমি আপনার কথা যথেষ্ট বিশ্বাস করেছি। প্রমাণের দরকার নেই।

রুদ্রাক্ষ গম্ভীর হয়ে বলে, আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান মিস্টার সর্বজ্ঞ। মদ খাওয়াটাও আমার কাছে একটা স্পোর্টস। গোটা জীবনটাই আমার কাছে স্পোর্টস। লেট আস স্টার্ট এ স্পোরটিং ফ্রেণ্ডশিপ উইথ ড্রিংকস।

আমি ক্ষাণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে বললাম, কিন্তু আপনার মিটিং?

হ্যাং ইট। এইসব বোর্ড মিটিঙে কতগুলো বুড়ো শকুন বসে থাকে। রোজই ওদের ইনহিউম্যান মুখ দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেল। আপনাকে তো আর রোজ পাবোনা। চলুন।

অগত্যা বেজার মুখে আমাকে উঠতে হল। রুদ্রাক্ষ শিস দিতে দিতে বেশ চটপট পায়ে করিডোর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে ঝট করে একটা ঝকঝকে নীল রঙের ওপেল গাড়ির দরজা খুলে বলল, উঠে পড়ুন।

রুদ্রাক্ষ গাড়িটা প্রায় উড়িয়ে এনে ফেলল পার্ক স্ট্রিটে। গাড়িতে চাবি দিতেও যেন তর সয়না। তাড়াতাড়ি নেমে আমার নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে প্রায় লাফিয়ে ঢুকল ভিতরে। আমি টের পাচ্ছিলাম, বেঁটেখাটো এবং মেদবহুল চেহারা হলেও রুদ্রাক্ষের গায়ে যথেষ্ট জোর। এমন জোরে আমার কব্জা চেপে ধরে আছে যে, বার ছুয়েকের চেষ্টাতেও আমি ছাড়াতে পারলাম না।

একটা টেবিল দখল করে বসেই রুদ্রাক্ষ মরুভূমির পথহারা পথিকের মতো তৃষ্ণার্ত গলায় ডাকতে লাগল, ব্যেরা! ব্যোয়! জলদি! হুইস্কি! হুইস্কি! জলদি! দো বড়া পেগ। জলদি! জলদি! কুইক ম্যান।

বেয়ারা এসে তুজনের সামনেই হুইস্কি নামিয়ে দিয়ে গেল। আমি গেলাসটা ছোঁয়ার আগেই রুদ্রাক্ষ তুটি পেগ নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, আমার ভেতরটা একদম খটখটে হয়ে শুকিয়ে ছিল।

আমি কিছু বলার না পেয়ে দেঁতো একটু হাসলাম। মদ না খেলেও মাতালদের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই ওঠাবসা। মৃদু স্বরে বললাম, হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিংক। সাহেবদেরও দেখবেন, অত তাড়াতাড়ি খায়না।

সাহেব? বলে রুদ্রাক্ষ আবার ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বলে, শালা সাহেবদের কথা বাদ দিন। ও শালারা জানে কি? ব্যেরা আউর এক বড়া পেগ।

আমি তখনো গেলাসটা ছুঁইনি। রুদ্রাক্ষের শুষ্ক অভ্যন্তরে আরো দু পেগ নেমে গেল। আমি চোখ গোল করে চেয়ে রইলাম।

তৃতীয় বড়া পেগের গতিও একই। কিন্তু রুদ্রাক্ষ দুই বড় পেগের পর সেই যে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল আর চোখ খুললই না। আমি সন্তর্পণে উঠে চোরের মতো চারদিকে চেয়ে স্যুট করে বেরিয়ে পড়ি। বড় পেগের হুইস্কিটি অস্পৃষ্ট অবস্থায় টেবিলেই পড়ে থাকে। বেরিয়ে এসে একটা ওষুধের দোকান থেকে আমি লাটুবাবুকে খবরটা দিই।

লাটুবাবু, রুদ্রাক্ষর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

বাঃ। বলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন লাটুবাবু, কী আলাপ হল?

সে অনেক কথা। তবে খুব তাড়াতাড়িই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

বলো কি? তুমি তো সাঙ্ঘাতিক ছেলে হে!

আমি আমতা আমতা করে বলি, রুদ্রাক্ষ কিন্তু বেঁটে।

বেঁটে! ওঃ, সে আমি জানি। বেঁটে কথাটা ঠিক নয়। অ্যাভারেজ বাঙালির যা হাইট তাই। খুব বেশী ঢ্যাঙা হওয়াটাও তো কাজের কথা নয়।

তা বটে।

বটেই তো। হাইট যাই হোক অন্য সব দিকেই মাপে বেশ বড়। ওসব তোমাকে দেখতে হবে না। শুধু দেখবে চরিত্রটা কেমন।

আমি ফের আমতা আমতা করে বলি, চরিত্র খারাপ কিছু নয়। তবে একটু আধটু মদ খায় আর কি! ইন ফ্যাকট এইমাত্র ওকে মাতাল অবস্থায় একটা রেস্টুরেণ্টে ফেলে রেখে আমি উঠে এসেছি।

লাটুবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, ফেলে রেখে এসেছো মানে? ফেলে এলে কেন? ওই অবস্থায় ওর যে-কোনোরকম বিপদ-আপদও তো হতে পারে। ধরো পকেটের টাকাগুলোই কেউ তুলে নিল—

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি কি মদ খাওয়াকে সাপোর্ট করেন?

লাটুবাবু উদার গলায় বলেন, আরে মদ খাওয়া কাকে বলো তুমি? একটা টনিক খেলেও তো তার সঙ্গে খানিকটা মদ পেটে যায়। তাছাড়া রুদ্রাক্ষ কাজের লোক, দারুণ মাথার খাটুনি, একটু আধটু ওদের খেতেই হয়।

আমি তবু বিষয়টা বিশদ করে বলি, একটু-আধটু নয়, রুদ্রাক্ষ আমার চোখের সামনে বিশ মিনিটের মধ্যে ছ পেগ—।

আঃ, বড্ড বকো তুমি। ওটাও একটা কোয়ালিফিকেশন, বুঝলে! খায় তো পুরুষের মতোই খায়। তুমি আর দেরী কোরোনা, ছুটোপাটি করে এক্ষুনি যাও। গিয়ে দেখ ছোকরার কোনো বিপদ হল কিনা। ওকে বরং বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। যাও।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা রেখে দিই এবং আবার সেই রেস্টুরেণ্টে ফিরে আসি।

রুদ্রাক্ষ ঠিক একইরকমভাবে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। তার সামনে এবং উলটো দিকে টেবিলের ওপর দুটি হুইস্কির গেলাস স্থির দাঁড়িয়ে। গোটা তিনেক বিল অ্যাসট্রের তলায় আধচাপা হয়ে পড়ে আছে। উঁকি মেরে দেখি, বেশ লম্বা টাকার বিল। আট পেগ হুইস্কি তো কম নয়। বিলটা রুদ্রাক্ষরই মেটানোর কথা। কিন্তু সে যেমন তূরীয় রাজ্যে বিরাজ করছে সেখানে তার নাগাল পাওয়া বড়ই কঠিন।

তবু আমি তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম, রুদ্রাক্ষবাবু ও রুদ্রাক্ষবাবু!

জড়ানো গলায় রুদ্রাক্ষ জিজ্ঞেস করল, কোন শালা রে?

আমি। আমি রবি সর্বজ্ঞ।

কী অজ্ঞ?

আমি রবি।

ওঃ। বলে রুদ্রাক্ষ চোখ মেলে চায় এবং নিজের গেলাসটা দেখতে পেয়ে স্বয়ংক্রিয় হাতে সেটা তুলে নেয়। আমার দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে বলে, মুখটা চেনা-চেনা লাগছে। কে তুমি চাঁদু?

আমি ভড়কে গিয়ে বলি, এইমাত্র তো আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল।

আরে! তাই তো আপনিই তো সেই আমার ফ্যান। হোয়েন আই ওয়াজ এ ফুটবলার আপনি তখন—।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ খুব ভাল। কী নামটা যেন!

রবি সর্বজ্ঞ।

ইয়েস, আই রিমেমবার। আপনি তো ওয়াইন মারচেণ্ট।

আমি বিগলিত হয়ে বলি, বাঁচা গেল। মনে রেখেছেন।

রাখব না মানে! আমি কি শালা মাতাল যে, একটু আগের কথা মনে থাকবে না!

তা অবশ্য নন। কিন্তু বিলটা এইবেলা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল।

কিসের বিল?

এই যে, বেয়ারা রেখে গেছে। বলে আমি বিলগুলো তার হাতে দেওয়ার চেষ্টা করি।

কিন্তু ততক্ষণে তৃতীয় বড় পেগ তার ভিতরে নেমে গেছে। গেলাসটা রেখে রুদ্রাক্ষ আবার পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ফেলে।

দ্বিতীয় দফা বিপদে পড়ে এবার আর আমি বুদ্ধি হারাই না। রুদ্রাক্ষর মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের, মোটামুটি ভালমানুষ ও আমারই মতো একজন ডিফেনসের খেলোয়াড়কে কী ভাবে চালনা করতে হয় তার

একটা আন্দাজ আমার আছে। আমি হাত বাড়িয়ে রুদ্রাক্ষর পকেট থেকে তার লম্বা এবং বড়সড় পার্সটি বের করে বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিই। তারপর রুদ্রাক্ষকে নাড়া দিয়ে জাগাই।

সে ঘোর-ঘোর গলায় বলে, কোন শালা রে?

আমি তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, তোমার বাবা। ওঠো তো চাঁদ, ওঠো।

আশ্চর্য এতে কাজ হয়। ঝাঁকুনির চোটে তার চোখ থেকে গোল চশমাটা পিছলে গিয়েছিল। আমি সেটা তুলে আমার জামার বুকপকেটে রাখি। রুদ্রাক্ষ চোখ খোলে এবং আমাকে দেখে কেমন যেন বিহ্বল ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে বলে, বাবা! মাই গুডনেস! কিন্তু আমি উঠতে পারছি না বাবা।

ওঠো। সবাই দেখছে। ডোন্ট ক্রিয়েট এ সিন!

আচ্ছা বাবা, উঠছি। বলে রুদ্রাক্ষ উঠতে গিয়ে টাল খেতে থাকে। আমি শক্ত করে তাকে ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে দরজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকি।

রুদ্রাক্ষ কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, আমি কি খুব বেশী খেয়েছি বাবা? তুমি কি বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাকে বকবে?

খুব বকব। ছিঃ ছিঃ, এভাবে কেউ খায়? আমি তার বাবার গলার স্বর না জেনেও বাবার ভূমিকায় ভাল পার্ট করতে থাকি।

রুদ্রাক্ষ ব্যথিত গলায় বলে, আমি যে খাইনা তা তো তুমি জানো বাবা! জানো না? আই অ্যাম এ গুড ম্যান। আজ শালা বোর্ড মিটিঙের পর ডিরেকটর আমাকে এমন একটা প্রোপোজাল দিল যে, মাল না খেয়ে উপায় ছিল না।

আমি বুঝতে পারলাম, রুদ্রাক্ষ চোখেমুখে মিথ্যে কথাও বলে। কারণ আজ সে বোর্ড মিটিঙেই যায়নি এবং সম্ভবত ডিরেকটরের সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। পাত্র হিসেবে লাটুবাবু বা অন্যান্য পাত্রীর বাবা একে যাই ভেবে থাকুক, আমি রুদ্রাক্ষকে একটা সাদামাটা ক্যারেকটার

সারটিফিকেট দিতেও এখন দ্বিধা করব। তবু গলাটা যথাসম্ভব দৃঢ় ও শান্ত রেখে আমি প্রশ্ন করি, কী প্রস্তাব ?

সে তুমি ভাবতে পারবে না। আই হ্যাভ টু ম্যারি হিজ ডটার।

ডটার ?

হ্যাঁ, ডটার। তিনবার ডিভোর্স করে এখন স্বামীহারা অবস্থায় বাপের ঘাড়ে চেপেছে। অ্যাণ্ড আই হ্যাভ টু স্যালভেজ দ্যাট লেডি।

আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। রুদ্রাক্ষ হাতছাড়া হলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে ধমকে উঠি, খবর্দার রুদ্রাক্ষ, ও-কাজও কোরোনা।

রুদ্রাক্ষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অতি অভিমানের স্বরে বলে, রেগে গেলেই তুমি আমাকে কেন রুদ্রাক্ষ বলে ডাকো বাবা ? আমার ঢুলু নামটা কি তোমার মনে পড়ে না তখন ?

আমি উদ্বেগে শ্বাস বন্ধ করে বলি, পড়ে। তবে তখন ও-নামে ডাকতে ইচ্ছে করেনা।

রুদ্রাক্ষ চোখের জল মুছে বলে, আমি তোমার খারাপ ছেলে বাবা।

আমি তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সামলে দিই এবং রেস্টুরেন্টের বাইরে এনে গাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে দাঁতে দাঁত চেপে বলি, ডিরেকটর কবে তোমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছে ?

আই ডোণ্ট রিমেমবার। মে বি ইয়েসটারডে। আঃ অত জোরে আমার হাত চেপে ধোরোনা। লাগছে।

আমি মুঠোটা একটু আলগা করি। লাগারই কথা। যা জোরে চেপে ধরেছিলাম। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলি, চাবিটা দাও, গাড়িটা খুলি।

রুদ্রাক্ষ ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, ডোণ্ট বদার। পকেট থেকে বের করে নাও। একটু আগে আমার পার্সটাও তুমি বের করে নিয়েছো।

ঠিক কথা। আমি দ্বিরুক্তি না করে তার প্যাণ্টের ডান পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিয়ে বলি, ওঠো।

সে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসে বলে, আমি চালাতে পারব না।

আমি প্রমাদ গুণে বলি, সে কী ?

সে অম্লান বদনে বলে, তুমি চালাও বাবা। আই সারেনডার। বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের সীটে গিয়ে বসে।

রুদ্রাক্ষর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি যা করেছি তা আমার জীবনের দুঃসাহসিকতম অ্যাডভেনচার। সেই ধকলে আমার শরীর কাহিল লাগছিল, মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। যে কোনো সময়ে আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতে পারি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারি। অথবা হঠাৎ চোঁ চাঁ দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারি। তবু লাটুবাবুর প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার এই বিপদের মধ্যেও একটা সুবাতাসের মতো বয়ে আসে। বলে, ভয় কি ? আমি তো আছি।

আমাদের একটা পুরোনো ডজ গাড়ি ছিল। এখন তা আমার বড়দা মহাতোষের দখলে। তবে একদা আমি সেটা দাবড়েছি। মোটরগাড়ি চালানোর সেই অভিজ্ঞতা আজ এতকাল পরে ফের কাজে লাগল। আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে খুব বিরক্তির গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবে ?

বলেই বুঝলাম, ভুল হয়েছে। একথা বাবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তবে ভুল হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। গাড়ির নরম গদিতে আধশোয়া হয়ে ঘাড় লটকে ইতিমধ্যে রুদ্রাক্ষ গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছে।

গাড়িটা কিছুদূর নিয়ে গিয়ে আমি থামাই এবং ফের সেই ওষুধের দোকান থেকে লাটুবাবুকে ফোন করি।

লাটুবাবু !

উত্তেজিত লাটুবাবু বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী ব্যাপার ?

রুদ্রাক্ষের ঠিকানা কী ?

কেন বলো তো ?

সেখানে ওকে পৌঁছে দিতে হবে। জ্ঞান নেই।

একেবারেই নেই ?

নাঃ।

ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখেছো ?

দেখেছি। আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে ছ পেগ হুইস্কি ওড়ায় তার পক্ষে সচেতন থাকা মুস্কিল। আর একটা কথা লাটুবাবু।

বলো।

রুদ্রাক্ষ কিন্তু যখন তখন মিথ্যে কথা বলে।

বলে নাকি ?

আপনি ভেবে দেখবেন মিথ্যে কথা বলা ভাল না মন্দ।

লাটুবাবু বিরক্ত হন। বলেন, মিথ্যে কথা আমিও বলি। নিজের প্রাণ মান বাঁচাতে মাঝে মাঝে সব মানুষকেই বলতে হয়। যুধিষ্ঠিরের মতো লোককেও বলতে হয়েছিল। কথা হল, কোন সিচুয়েশনে বলে সেটা দেখতে হবে।

তা অবশ্য ঠিক।

লাটুবাবু আমার জবাবে একটু খুশি হন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, দেশের মান্যগণ্য নেতারাও তো ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলছে রোজ। ও হল ডিপলোম্যাসি। মুখ যাই বলুক মন তো আর বলছে না। তুমি শুধু লক্ষ্য করবে, ছোকরার চরিত্রটা কেমন।

আচ্ছা, তাই হবে।

আর একটা কথাও শুনে রাখো। ঝিলিকের সঙ্গে বিয়েটা কিন্তু লাগাতেই হবে। ব্যাপারটা এখন আমার প্রেস্টিজের ইস্যুতে দাঁড়িয়ে গেছে।

চেষ্টা করছি। তবে আর একটা মুস্কিল দেখা দিয়েছে।

সেটা কী ?

রুদ্রাক্ষর কোমপানির ডিরেকটর চান তাঁর মেয়েকে রুদ্রাক্ষ বিয়ে করুক।

বলো কী? লাটুবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ!

আমি কণ্ঠস্বর নরম করে বলি, এখনই হাল ছাড়বেন না। সেই মেয়েটা তিনবার ডিভোর্স করেছে। রুদ্রাক্ষরও তাকে পছন্দ নয়।

কক্ষনো পছন্দ হওয়া উচিত নয়।

আমি শান্ত গলায় বললাম, এবার রুদ্রাক্ষর ঠিকানাটা বলুন।

লাটুবাবু ঠিকানাটা দিয়ে বললেন, সাবধানে পৌঁছে দিও। কোনোরকমে পড়ে টড়ে গিয়ে চোটটোট যেন না লাগে।

আমি সেই ঠিকানায় অর্থাৎ মেরলিন পার্ক পর্যন্ত খুবই সাবধানে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলাম। তবে সেই সাবধানতা রুদ্রাক্ষর জন্য নয়। আমার নিজের জন্যই। গাড়ি চালানোর অভ্যাস বহুকাল নেই। ড্রাইভিং লাইসেনস কবে হারিয়ে গেছে। কোনোরকম ট্র্যাফিকের ঝামেলায় পড়লে কপালে কষ্ট আছে।

আমাকে যতটা বোকা বলে মনে হয় আমি হয়তো ততটাই বোকা। কিন্তু রুদ্রাক্ষর বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা যে চূড়ান্ত বোকামি এবং বিপজ্জনক কাজ হবে সেটা না বোঝার মতো বোকা আমি নই। তাই চমৎকার একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে, রুদ্রাক্ষর বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে আমি গাড়িটা দাঁড় করাই।

ইচ্ছে ছিল, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে গাড়ি সমেত ঘুমন্ত রুদ্রাক্ষকে রেখে আমি কেটে পড়ব। মাতালদের ভাগ্যই তাদের দেখে। আজ পর্যন্ত আমি কোনো খাঁটি মাতালকে সত্যিকারের কোনো বিপদে পড়তে দেখিনি। সুতরাং রুদ্রাক্ষও যে পড়বে না সে বিশ্বাস আমার ছিল।

কিন্তু যে দূরদৃষ্টির অভাবে আমার জীবনে কোনো উন্নতি হলনা তার ফলেই ফাঁড়াটা কেটেও কাটল না। নামতে যাচ্ছি, পিছন থেকে অত্যন্ত অভিমানের গলায় রুদ্রাক্ষ বলল, বাবা, আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছো?

রুদ্রাক্ষর পান-ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা এতই সীমাবদ্ধ ছিল

যে, আমি ভূত মনে করে চমকে উঠলাম। বাস্তবিক ওরকমভাবে ঝড়ের গতিতে ওই পরিমাণ মদ্য পানের পরও সে যে চেতনায় আছে তা শুঁড়ির ছেলে হয়েও আমি আন্দাজ করতে পারিনি। তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা সীমা ছেড়ে অসীমের দিকে ধাবিত হতে লাগল।

হতাশভাবে আবার হুইলের পিছনে বসে পড়ে বললাম, বাড়ি এসে গেছে রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটা হাই তুলল। গাড়ির ছোট্ট পরিসরে যতখানি সম্ভব হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর হঠাৎ নেশাটা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল, আরে? তুমি কে বলো তো! মুখটা চেনা-চেনা লাগছে।

একটু ভীত গলায় আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি রবি সর্বজ্ঞ।

ওঃ হোঃ। উই ওয়্যার ইন দি সেম কলেজ! কিন্তু আমি এখানে কেন?

এটাই তো তোমার বাড়ির রাস্তা রুদ্রাক্ষ?

তা জানি। কিন্তু এ সময়ে বাড়িতে ঢুকলে আমার বাবাই আমাকে বের করে দেবে। বলবে, রুদ্রাক্ষ গো অ্যাণ্ড সি দি লাইফ। ডোণ্ট বি এ সিলি হোম-সিক কিচেন-ক্যাট।

বিপন্ন গলায় আমি বলি, তাহলে?

রুদ্রাক্ষ হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল, আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্টও আছে। চলো সর্বজ্ঞ, লেট আস কিপ ইট।

কিন্তু আমার কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নেই রুদ্রাক্ষ।

তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি আমার বন্ধু, বুজম্ ফ্রেণ্ড। তোমাকে নিয়ে গেলে কেউ কিছু মনে করবেনা, বরং খুশিই হবে। লীনার হবিই হল মেকিং নিউ ফ্রেণ্ডস।

লীনা কে?

আমার বসের মেয়ে। জেম অফ এ গার্ল।

আমি গোয়েন্দার মতো মাথা খাটিয়ে প্রশ্ন করি, তার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক ?

রুদ্রাক্ষ আবার একটা হাই তুলল। নিষ্কম্প হাতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর একটু ভাবালু গলায় বলল, তুমি ফ্লোরেনস নাইটিংগেলের নাম শুনেছো ?

আমি অপমান বোধ করে আহত গলায় বললাম, না শোনার কী ? ইন ফ্যাকট আমাকে ইস্কুলে লেডি উইথ দা ল্যাম্প কবিতাটা পড়তে হয়েছিল।

রুদ্রাক্ষ খুশি হয়ে বলল, লীনা হচ্ছে একজ্যাকটলি সেইরকম। চোখ বুজে একটু ইম্যাজিনেশনকে খুঁচিয়ে তোলা। আহাঃ, চোখটা বোজই না।

আমি বুজলাম।

রুদ্রাক্ষ বলল, কল্পনা কর, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও আহত সৈনিকরা পড়ে আছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কেউ কোথাও নেই। আহত সৈনিকরা কেউ বলছে "জল ! জল !," কেউ কাতরাচ্ছে "ওরে বাবা ! মরে গেলুম !" কেউ মৃত্যু যন্ত্রণায় নীল হয়ে খাবি খাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো সর্বজ্ঞ ?

পাচ্ছি। তবে ফোকাসিংটা ঠিক হচ্ছে না। একটু আবছা।

তাতেই হবে। এবার কল্পনা করতে থাকো, একজন মহিলা একটি ছোট্ট লণ্ঠন হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকছেন। করুণায় দুটো চোখ ভরা। আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন, অ্যান্টিসেপটিক লাগাচ্ছেন, দিচ্ছেন টেট ভ্যাক অ্যাণ্ড ফার্স্ট এইড—

সে আমলে ওসব ছিলনা রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার ইমাজিনেশন খুব পুওর সর্বজ্ঞ। ছিলনা আমিও জানি। তা বলে কল্পনা করতে দোষ কী ? জাস্ট দৃশ্যটা কল্পনা করে যাও। একটা যুদ্ধক্ষেত্র, আহত সৈনিক ও করুণাময়ী একটি মেয়ে। কনসেনট্রেট অন দা গার্ল। করেছো ?

চোখ বুজে আমি প্রাণপণে দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে বলি, করেছি। কিন্তু সময়টা সন্ধ্যা বলে মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

ডোণ্ট বি সিলি। মুখটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল হৃদয়।

তা বটে।

লীনা অবিকল ওই রকম। এই জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে চারদিকেই পড়ে আছে মার-খাওয়া, আহত, পরাজিত সব সৈনিক। তার মধ্যে লীনা একটা লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিচ্ছে প্রলেপ, মুখে তুলে দিচ্ছে তৃষ্ণার জল। দেখতে পাচ্ছো?

আমি চোখ বোজা রেখেই বললাম, খানিকটা। তবে লীনার হাতে লণ্ঠনটা কিসের?

বিরক্ত রুদ্রাক্ষ বলে, সর্বজ্ঞ, আমি জানি প্রপার নেমস আর নন-কনোটেটিভ। অর্থাৎ নামের সঙ্গে লোকটার প্রায়ই মেলেনা। কিন্তু তোমার সর্বজ্ঞ পদবীটার সঙ্গে তোমার অ্যাকচুয়াল নলেজের হেভেন অ্যাণ্ড হেল ডিফারেনস। লণ্ঠনটা তো আর সত্যিকারের লণ্ঠন নয়। রবীন্দ্রনাথের গান শোনোনি! কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো…।

গুণ গুণ করে একটু গাইলও রুদ্রাক্ষ। বেশ সুরেলা গলা।

শুনেছি। আমি বললাম।

লীনার লণ্ঠনটাও আসলে ওই প্রাণের প্রদীপ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললাম, এবার বুঝতে পেরেছি। জলের মতো পরিষ্কার। ফর ইওর ইনফরমেশন রুদ্রাক্ষ, ওই রবীন্দ্র-সংগীতটা আমি বহুবার শুনেছি।

কিন্তু লীনাকে দেখনি। তার দেখা পাওয়া অবশ্য খুবই শক্ত। শী ইজ এ ভেরি বিজি সোশ্যাল ওয়ারকার। এই কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে চলে যাচ্ছে বাঁকুড়া, আবার আদিবাসী গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের মাদুর বোনা শেখাচ্ছে, বন্যার সময় রিলিফ টিম নিয়ে চলে যাচ্ছে মেদিনীপুর। অলওয়েজ মুভিং। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এটাও বড় কথা নয়? এর চেয়েও বড় কথা আছে নাকি?

আছে। লীনা হ্যাজ হার ওন ফিলজফি অফ লাইফ।

এবার আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনা। উষ্মার সঙ্গে বলেই ফেলি, কিন্তু রুদ্রাক্ষ, একটু আগেই তুমি মাতাল অবস্থায় বলেছো, মেয়েটা তিনবার ডিভোর্স করেছে এবং তোমার বস চায় তুমি ওকে বিয়ে করো এবং তুমি ওকে বিয়ে কর.ত চাওনা।

রুদ্রাক্ষ প্রায় দশ সেকেণ্ড স্তম্ভিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, বলেছি, কিন্তু মাতাল অবস্থায় নয়। জীবনে আমি কখনো মাতাল হইনি সর্বজ্ঞ।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, অফিসের ঘরে যে রুদ্রাক্ষকে আবিষ্কার করে আমি উল্লসিত হয়েছিলাম সে আর এ এক নয়। পেটে মদ না থাকলে রুদ্রাক্ষ অতি সাধারণ ডিফেনসের খেলোয়াড়। তখন তার ওপর ছড়ি ঘোরানো আমার মতো লোকের পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু ছ পেগ হজম করার পর খোলস ছেড়ে যে রুদ্রাক্ষ বেরিয়ে এসেছে সে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। একে আর একটু সাবধানে ট্যাকল করা উচিত মনে হওয়ায় আমি স্ট্র্যাটেজি পাল্টে তার পিঠ চাপড়ে বললাম, ফরগেট ইট। মাতাল শব্দটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু লীনার তিনটে বিয়ে এবং ডিভোর্স ইত্যাদির ব্যাপারটা কি ভাল? অবশ্য তোমার যদি কোনো সফট কর্ণার থেকে থাকে তাহলে কিপ ইট এ সেক্রেট, আমি শুনতে চাই না।

রুদ্রাক্ষ মাথা নেড়ে বলল, আরে না। লীনার কোনো সেক্রেট নেই। তার তিনবার বিয়ের কথা সবাই জানে। আর ওই বিয়েগুলোও আসলে তার পরোপকারী স্বভাবেরই একটা দিক। যাকে বলা যায় বেনিভোলেণ্ট ম্যারেজ।

তার মানে কি রুদ্রাক্ষ?

লীনার হবি হচ্ছে খুঁজে খুঁজে হতাশাগ্রস্ত, ভেঙে পড়া, বিধ্বস্ত

কোনো মানুষকে বের করে তাকে বিয়ে করা। তারপর আস্তে আস্তে আশা, ভরসা, ভালবাসা ও সাহচর্য দিয়ে লোকটাকে আবার গড়ে তোলে সে। যখন লোকটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং নিজের শক্তিতে চলতে শুরু করে তখন লীনা তাকে ডিভোর্স করে আবার নতুন কোনো বিধ্বস্তকে খুঁজতে থাকে।

আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনা। এবার আমার স্তম্ভিত হওয়ার পালা।

রুদ্রাক্ষ আমার দিকে চেয়ে একটা চোখ টিপে বলে, লেট আস গো সর্বজ্ঞ। লীনা ইজ ইনটারেস্টিং।

আমি অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিই।

॥ ছয় ॥

আমি অকপটে বলতে চাই, লীনা যে ইনটারেস্টিং সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে নিষ্ঠাবতী বিধবারা যেভাবে চুল ছেঁটে ফেলত তার চুল তেমনই ছাঁটা। খদ্দরের একটা নামাবলী শাড়ি তার পরনে। গায়ের ব্লাউজটিও নামাবলীর। ডান হাতে অত্যন্ত দামী একটি ক্যালকুলেটর কাম ডিজিটাল রিস্টওয়াচ ছাড়া আর কোনো আভরণ নেই। গলায় একটা ঝুটো বা আসল মুক্তোর মালা অবশ্য আছে, কানে দুটো রিং এবং সে দুটিও সোনার হওয়াই সম্ভব। মুখখানা একটু ভোঁতা হলেও আহলাদ এবং লাবণ্যে ভরা। চোখ দুটি বেশ টানা টানা। ঠোঁট পুরন্ত ও সর্বদাই হাস্যময়। লীনা খুব ছিপছিপে নয় বটে তবে আঁটো গড়ন। রং ফর্সাই তবে রোদে ঘোরার ফলে কিছু তাম্রাভ। বয়স ত্রিশের আশে পাশে। গ্র্যাণ্ড হোটেলের কুচবিহার স্যুইটে লীনা হাতে একটা কোমল পানীয়ের গেলাস নিয়ে বসেছিল। তাকে ঘিরে বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার অন্তত জনা দশেক ভদ্রলোক। রুদ্রাক্ষ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর আমি রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কারণ এই দশজনের কয়েকজন বেশ বড় সড় শিল্পপতি, কয়েকজন মস্ত মস্ত মালটিন্যাশনালের বিগ একজিকিউটিভ, একজন প্রাক্তন এম. পি. এবং একজন ফিল্মস্টার। আশ্চর্যের বিষয় সকলেই লীনাকে তেল দিচ্ছে, খুশি করার চেষ্টা করছে। আমি গাড়ল হলেও জানি, লীনা একটা মালটিন্যাশনালের বড় কর্তার মেয়ে বলেই তার এত খাতির নয়। অন্য কিছু আছে।

রুদ্রাক্ষ প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের জন্য একটু সময় ফাঁক দিয়েই কাজে লেগে পড়ল। টকাটক দুটো হুইস্কি নামিয়ে ধাতস্থ হল সে।

আমি তাকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম, লীনাকে এই সব বড় বড় লোক তেল দিচ্ছে কেন রুদ্রাক্ষ ?

রুদ্রাক্ষ আমার কানে কানে বলল, তুমি গাড়ল না হলে বুঝতে আজকাল সোশ্যাল ওয়ারকারদের প্রতিপত্তি কী প্রচণ্ড। মিনিস্টার থেকে ফিল্মস্টার, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে বস্তিবাসী, ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে নকশাল সব জায়গাতেই সোশ্যাল ওয়ারকারদের অবাধ এবং অনায়াস যাতায়াত। এঁরা তুই বিরুদ্ধ শিবিরের মধ্যে চমৎকার লিয়াজেঁ। বা যোগাযোগকারী হিসেবেও কাজ করেন। ধরো কোনও বিগ ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট কোনো মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় পেরে উঠছে না। তখন সে এই লীনার মতো কোনো সোশ্যাল ওয়ারকারকে ধরে। যেমন তেমন সোশ্যাল ওয়ারকারকে দিয়ে অবশ্য এ কাজ হয় না। আপার ক্লাস, গুড ব্যাকগ্রাউণ্ড, সঠিক ফ্যামিলি কানেকশন ছাড়া লীনার দরের সোশ্যাল ওয়ারকার হওয়া অসম্ভব।

তাহলে সোশ্যাল ওয়ার্কও কি একটা ক্যারিয়ার ?

এ ভেরি লুক্রেটিভ ক্যারিয়ার। একটা নন পলিটিক্যাল মুখোশ থাকলে তো কথাই নেই। গ্রাণ্ড হোটেলের এই পার্টির পরই হয়তো লীনাকে দেখা যাবে জগদ্দলের কুলি ধাওড়ায়। তখনো দেখবে মুখে কোনো বিরক্তি নেই, হাসিটিও অমলিন। সোশ্যাল ওয়ারকার হতে গেলে এসব বেসিক গুণ চাই।

লীনার সবই আছে, না ?

সবই আছে। কিন্তু এখন লীনা ইজ লুকিং অ্যাট ইউ উইথ সাম ইন্টারেস্ট সর্বজ্ঞ। গুড লাক টু ইউ।

লীনার দিকে চেয়ে আমি একটু লজ্জায় পড়লাম। বাস্তবিকই লীনা আমার দিকে খুবই কৌতূহলভরে চেয়ে আছে। শরীর শ্লথ, চোখের দৃষ্টি কোমল ও গভীর।

লীনা খুবই স্নেহের সঙ্গে বলল, আপনি কিছু নিচ্ছেননা ? হুইস্কি বা অন্য কিছু ?

আমি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললাম, আমি খাইনা।

তাহলে নরম কিছু খান। আসুন, আমার পাশে এসে বসুন।

আমি একটু ভয়ে ভয়েই আদেশ পালন করি।

লীনা একটা নরম পানীয় আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, আপনি যে রুদ্রাক্ষর পুরোনো বন্ধু নন তা বুঝতে পারছি। আমি ওর পুরোনো বন্ধুদের চিনি। আপনি ওর কিরকম বন্ধু ?

খুব। আমি সংক্ষেপে বলি ও সত্য গোপন রাখি।

লীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওকে যে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে তাই আজকাল আমার ভাবনা। একদম অ্যালকোহোলিক হয়ে গেছে। ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কাজে মন নেই, ক্যারিয়ারে মন নেই। ওকে নিয়েই আমার এখন সবচেয়ে বেশী জ্বালা।

আমি লীনার বাড়িয়ে দেওয়া প্লেট থেকে একটা চীজ পকোড়া তুলে চিবোতে চিবোতে বলি, ওর সম্পর্কে আপনার কোনো প্ল্যান আছে ?

লীনা আমার মুখের দিকে আনমনে চেয়ে বলে, একজনকে নিয়ে কি আমার কাজ ? হাজার জনার প্রবলেম সামলে আবার আর একজনকে আলাদা করে সামলানো কতকাল আর সম্ভব ?

আমি নাক সিঁটকে বললাম, রুদ্রাক্ষ এক নম্বরের মাতাল আর মিথ্যেবাদী। ঘুষও খায়। ইন ফ্যাকট ওর অনেক গার্ল ফ্রেণ্ডও আছে।

লীনা মাথাটি একদিকে কাৎ করে সায় দিয়ে বলল, সব জানি। আর তাইতো ওর জন্য এত ফিল করি। ভীষণ আত্মবিশ্বাসের অভাব ওর। অত কোয়ালিফিকেশন, সামনে দুর্দান্ত ক্যারিয়ার, তবু কেমন বেচারা-বেচারা ভাব, লক্ষ্য করেছেন ?

হ্যাঁ। ওকে কোনো মেয়ের বিয়ে করা উচিত নয়।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না না, একথাটা আপনি ঠিক বললেন না মিস্টার সর্বজ্ঞ। আমার প্রথম হাজব্যাণ্ডটিকে যখন আমি বিয়ে করি তখন সে এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় ছিল।

এর চেয়েও খারাপ ? আমি অবাক হওয়ার চেষ্টা করি।

অনেক খারাপ। একটাও সত্যি কথা বলত না। মানে, বলতে পারত না আর কি। এমন কি আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সাতদিনে ও নিজের সাতটা নাম আমাকে বলেছে। কোথা থেকে সব ফলস বিলিতি ডিগ্রির সারটিফিকেট জোগাড় করে বড় বড় কমপানিতে চাকরি নিত। দু' চার মাসের বেশী কোথাও রাখত না। পর পর দুজন বউ ওকে ছেড়ে চলে গেছে। সকাল থেকে রাত অবধি মদ খেত, তবু নেশা হত না। সব সময়ে বিড় বিড় করে কী সব বকত। অসভ্য সব স্ল্যাং ব্যবহার করত কথায় কথায়। একবার শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আলাপ হয়ে যায়। সেও এক ঘটনা। বিনা টিকিটে দিব্যি ফিটফাট সাহেব সেজে ফার্স্ট ক্লাসে বসে একটা অবজারভার কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পাইপ টানছিল। সাধারণ চেকার হলে ওর ওই কেতা দেখে কাছে ঘেঁষতেই সাহস পেত না। তবে সেদিন ছিল স্পেশাল চেকিং। বর্ধমান স্টেশনে ওকে পুলিশ ধরে নেয় আর কী। ও বার বার বোঝাচ্ছিল যে ওর পিকপকেট হয়েছে। কিন্তু ওর মুখ দেখেই আমার মনে হচ্ছিল, মিথ্যে কথা বলছে। যাকগে, আমি ইনটারভেন করি এবং টিকিটের দাম দিয়ে দিই। পরে যখন বুঝলাম লোকটা টোটাল ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে তখনই ডিসিশন নিলাম, এই লোকটার স্যালভেশন দরকার। বছর তিনেক লেগেছিল ওকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, এখন সে কী করছে ?

এখন অ্যামেরিকায়। ভাল চাকরি করছে, একজন অ্যামেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।

আর মিথ্যে কথা বলে না ?

এই প্রশ্নে লীনা অস্বস্তি বোধ করে বলে, ঠিক তা নয়। তবে অকারণে বলে না। এখন তার সমস্ত মিথ্যে কথাগুলোই মোটিভেটেড অ্যাণ্ড প্রফিটেবল।

আর সেই সব ফলস ডিগ্রি ?

সেগুলো আমি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তবে দু একটা আমি কাজে লাগবে ভেবে পোড়াইনি। শেষ পর্যন্ত সেই সব ভুয়ো বিদেশী ডিগ্রির জোরেই ওকে অ্যামেরিকা পাঠাতে পেরেছিলাম।

মদ খাওয়া কি ছেড়ে দিয়েছে ?

না, তবে আগের মতো বেহেড হয় না। অ্যামেরিকার অ্যালকোহলও খুব ভাল। আমি ওকে ড্রিংক করার সময় মাখন খেয়ে নিতে শিখিয়ে দিয়েছি। তাতে লিভারটার ওপর একটা প্রলেপ থাকে। ও সেটা এখনও মেনে চলে।

আপনি ওকে ডিভোর্স করলেন কেন ?

ডিভোর্স না করে কী করব ? আমার তো বিয়ের দরকার ছিল না। আমি তো চিরকুমারী থাকব বলে স্থির করেই নিয়েছি। বিয়ে করেছিলাম জাস্ট একটা সাফারিং সোলকে বাঁচার পথ দেখাতে। সে কাজটা যখন শেষ হল তখন আবার কুমারী জীবনে ফিরে এলাম।

আর আপনার সেকেণ্ড হাজব্যাণ্ড ?

ওঃ, সে ছিল একজন পলিটিকাল লিডার। খুব অ্যামবিশাস। কিন্তু মুশকিল হল, কোনো দূরদৃষ্টি ছিল না। দলের মধ্যে কোন গ্রুপটা বেশী পাওয়ারফুল বা কাকে হাতে রাখতে হবে তা বুঝতে পারত না বলে কিছুতেই ওপরে উঠতে পারছিল না। শেষ অবধি রাগ করে দল ছেড়ে অন্য দলে গেল। তারপর নিজেই একটা দল তৈরি করল। তারপর সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবত। অ্যাকচুয়ালি তার সঙ্গে আমার আলাপ কালীঘাটে। সে একটা কমণ্ডলু দরাদরি করছিল। তার সঙ্গে আগে আমার একটু আলাপ ছিল। তাই কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কমণ্ডুলু কিনছেন কেন ? সে বলল, সাধু হয়ে যাচ্ছি যে। বড় মায়া হল তাকে দেখে। কয়েকদিন তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রুদ্রাক্ষের মালা, কম্বল, চিমটে, গাঁজার কলকে এই সব কিনতে লাগলাম। হি ফেল ইন লাভ উইথ মি। আমাদের বিয়েটা অবশ্য

খুব আইনসম্মতভাবে হয়নি। কারণ তার আগের স্ত্রী ছিলেন। ফলে আমরা দুজন সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী হয়ে হরিদ্বারে চলে যাই। সেখান থেকেই আমরা কলকাঠি নাড়তে থাকি। একজন প্রাক্তন নেতা সাধু হয়ে গেছে এই ঘটনার কিছু পাবলিসিটি হওয়া দরকার ছিল।

পলিটিকসের সঙ্গে সাধু সন্ন্যাসী ও জ্যোতিষীদের যোগাযোগ অনেক দিনের। সন্ন্যাস নেওয়ার পর আমরা দুজনেই একটা মোটিভেটেড পাবলিসিটির শিকার হয়ে পড়ি। পত্র পত্রিকায় আমাদের নিয়ে দারুণ লেখালেখি হতে লাগল। ও অবশ্য তাতে খুব রেগে যেত। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, ফিলম ইনডাসট্রিতে যেমন পলিটিকসেও তেমনই গুড বয় বা গুড গার্লদের কোনো স্থান নেই। আমার সেকেণ্ড উনির এই একটা ব্যাপারে কিছু ডেফিসিয়েনসি ছিল। ওই মোটিভেটেড পাবলিসিটি সেই অভাবটা পূরণ করে দেয়। লোকে ওর সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। চায়ের দোকানে, পাড়ার আড্ডায়, অফিস-কাছারিতে ওকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা হয়েওছিল দারুণ। একজন নেতা শুধু সন্ন্যাসীই হয়ে যায়নি, একজন সমাজসেবিকাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েও গেছে। লোকে নিন্দেও করতে লাগল, প্রশংসাও করতে লাগল। ছ' মাসের মধ্যেই দেখলাম, ওর কাছে হিল্লি দিল্লি থেকে রিপোরটার আসছে, ছোটো বড় নেতারা আসছে। প্রভাব প্রতিপত্তি ও খাতির দারুণভাবে বেড়ে গেছে ওর। এক বছরের মধ্যেই দিল্লিতে আশ্রম করে দিল কয়েকজন ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বহু জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগল। অবশ্য ওর পক্ষে ডাইরেক্টলি আর পলিটিকসে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে রাজনৈতিক জগতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা নিতে শুরু করল। এখন যে-কোনো ক্যাবিনেট মিনিস্টারের চেয়েও ওর ক্ষমতা বেশী। আফটার হিজ সামথিং সাকসেস আই লেফট হিম।

আমি অতিশয় উত্তেজনায় আরও তিনটে চীজ পকোড়া খেয়ে ফেলি। সঙ্গে দু বোতল কোমল ঠাণ্ডা পানীয়। বাথরুম থেকে ঘুরে

এসে আমি কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নরম গলায় জানতে চাই, আর তৃতীয় জন ?

আমাদের নিবিষ্টভাবে কথা বলতে দেখে অন্যান্য অতিথিরা একটু সশ্রদ্ধ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বলছেন। কেউ আমাদের কথায় বাধা দিচ্ছেন না।

লীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, থার্ড কেসটা কিছুটা ট্র্যাজিক। আমার থার্ড হাজব্যাণ্ড ছিল একজন বেকার। ভারী একগুঁয়ে রকমের বেকার। চাকরি না-পাওয়ার এরকম কপাল বড় একটা দেখা যায় না। যেখানে চারজন লোক নেবে সেখানে সে হত পঞ্চম। যেখানে দুশ' লোককে চাকরি দেওয়া হবে সেখানে তার স্থান বাঁধা ছিল দুশ' এক নম্বর জায়গায়। সারাদিন সে কলকাতার পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে দোকানের জিনিসপত্র দেখত আর ভেবে রাখত, চাকরি পেলে কোন কোন জিনিস কিনবে। বিয়ে করারও একটা লোভ ছিল তার। সেই কারণে রাস্তায় ঘাটে সুন্দরী মেয়েদেরও লক্ষ্য করত সে। আমার সঙ্গে আলাপ একটা রি-ইউনিয়নে। সিঙ্গাড়া খেতে খেতে সে তার গল্প শোনাচ্ছিল আমাকে। আমার মনে হল, এরকম কেস তো কখনো হাতে নিইনি! দেখিই না নিয়ে। আলাপের দু মাসের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট এবং অনেক বিগ কানেকশনসও আছে। একজন বেকারকে চাকরি দেওয়া কোনো প্রবলেমই নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, লোকটা ছিল একগুঁয়ে। স্ত্রীর তদবিরে চাকরি নিতে কিছুতেই রাজি নয়। এমন কি ব্যবসা করার জন্য একটা ব্যাংকের লোন পাইয়ে দিলাম, সেটাও নিল না। আলটিমেটলি সে একটা দোকান খুলল। সেটা ফেল পড়ায় রিকশা চালাতে শুরু করল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় রিকশা ছেড়ে বাড়ির দালালী ধরল। শেষ অবধি বি এ পাশ সেই ছেলেটি আবার বেকার হয়ে পড়ল। আমি তাকে উদ্ধারের অনেক পন্থা ভেবে দেখেছি। কিন্তু এ যুগে ওরকম অনেস্ট, বোকা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক অচল। কিন্তু আমার

কাজ তো আমাকে করতেই হবে। সুতরাং আমি তাকে শেষ পথটা দেখিয়ে দিলাম। ওয়ান ফাইন মর্নিং হি কমিটেড সুইসাইড।

আমার ঠাণ্ডা পানীয় অনেকটা চলকে গিয়ে লীনার হাঁটু ও মেঝের কারপেট ভিজে গেল। চোখ কপালে তুলে বললাম, বলেন কি?

লীনা দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, দি ওনলি ওয়ে আউট ফর এ কনফার্মড আনএমপ্লয়েড।

ধাতস্থ হতে আমার অনেকটা সময় লাগল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, একে তা হলে ডিভোর্স করেননি?

লীনা চোখ কপালে তুলে বলল, ওঃ সিওর। ডিভোর্স করলে আইনের চোখে আমি আবার কুমারী। কিন্তু বাইচানস ম্যারেড অবস্থায় হাজব্যাণ্ড মারা গেলে আমার গায়ে যে বিধবার স্ট্যাম্প মারা হয়ে যাবে। তাই আমি তাকে স্যালভেশনের উপায়টি বলার আগেই ডিভোর্সের স্যুট ফাইল করে দিই। ডিক্রিটি হাতে পাওয়ার মুখে তাকে স্যালভেশনের পথটি বলি। সে যখন মারা যায় তখন আমি সম্পূর্ণ কুমারী।

আমার বিনা মদেই কেমন একটু বেসামাল লাগছিল। লীনা আমার হাতের ওপর হাত রেখে সামান্য চাপ দিয়ে বলল, সেই তুলনায় রুদ্রাক্ষের কেসটা তেমন শক্ত নয়। বুঝলেন?

আমি বুরবকের মতো তার দিকে চেয়ে থেকে বলি, রুদ্রাক্ষকে কি আপনি উদ্ধার করবেনই?

করাটা দরকার।

আপনি ওর প্রেমে পড়েননি তো?

লীনা অত্যন্ত নির্লিপ্ত একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, আমি জীবনে কারো প্রেমে পড়িনি। আমার একমাত্র প্রেম হল কাজের সঙ্গে।

আমি মোটামুটি একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লাম। অদূরে রুদ্রাক্ষ অবশ্য পাঁইটের পর পাঁইট মদ উড়িয়ে দিচ্ছিল। লীনা সস্নেহে ওর

দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমাকে বলল, ওর জীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখ কী জানেন ?

আমি সাগ্রহে লীনার মুখের কাছে কান এগিয়ে দিয়ে বলি, কী ?

মদ না খেলে ওর ব্যক্তিত্ব জাগে না। অত ব্রিলিয়াণ্ট হওয়া সত্ত্বেও রুদ্রাক্ষ ভারী মিনমিনে, মেয়েলী স্বভাবের মানুষ। ওর ধারণা কেউ ওকে সঠিক মূল্য দেয় না। এই কমপ্লেকস ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি ওর ভিতরে সেই দৈত্যটাকে জাগিয়ে তুলতে চাই যার নাম পুরুষকার। সেটা জেগে উঠলেই আমি ওকে ছেড়ে দেবো, টু হুম হি মে কনসার্ন।

আমি আর একটা কোল্ড ড্রিংক খাই এবং সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়ি।

॥ সাত ॥

পরদিন সকালেই লাটুবাবু আমার ঘরে হানা দিলেন। মুখে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ। চারদিকে চেয়ে বললেন, এঃ, তোমাকে যে একেবারে একঘরে করে ফেলেছে হে!

একঘরে কথাটার যে আর একটা অর্থ হয় তা দেখে আমি তাঁর খুব তারিফ করলাম।

লাটুবাবু আমার বিছানায় বসে কপালের দুশ্চিন্তাজনিত স্বেদ রুমালে মুছে বললেন, বাপের সম্পত্তি তাহলে কিছুই প্রায় হাতাতে পারোনি!

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মৌন থাকি। লাটুবাবু আমার দুর্দশাটা ভাল করে দেখুন এবং হৃদয়ঙ্গম করুন। তাতে যদি তাঁর হৃদয় একটু গলে।

লাটুবাবুর হৃদয়টা ইদানীং একটু নরমই যাচ্ছে। হঠাৎ বলে ফেললেন, আচ্ছা, রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়েটা লাগাও তো, আমি না হয় তোমার বকেয়া টাকার দশ হাজারই এক থোকে দিয়ে দেবো।

আমার হার্টের ব্যামো নেই, তবু বাঁ দিকের পাঁজরের পিঁজরাপোলে হৃদযন্ত্র জবাই করা মুর্গীর মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। ঠিক শুনেছি কিনা সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না।

লাটুবাবু কাজের কথায় এসে বললেন, এবার বলো কাল কী কী হল।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, বিয়েটা যত কঠিন হবে ভেবেছিলাম তার চেয়েও কঠিন লাটুবাবু। রুদ্রাক্ষ এক জাঁহাবাজ মহিলার পাল্লায় পড়েছে।

আবার মহিলা কে ? একটা তো বলছিলে বসের মেয়ে।

সেই।

আটকাচ্ছে কোথায়? বলে লাটুবাবু পা তুলে বসলেন এবং সবটা খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার ঋণটা অনেকদিন পড়ে আছে আমার কাছে। ভাবছি, দশ নয়, বিয়েটা যদি লাগাতে পারো তা হলে পনেরোই দিয়ে দেবো।

আমি ব্যথিত মুখে বলি, আপনি আর বলবেন না। আমার স্ট্রোক হতে পারে।

লাটুবাবু সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, নিজের চোখেই তোমার অবস্থাটা দেখে গেলাম। বলতে কী, খুবই খারাপ অবস্থায় আছো তুমি। তোমার জন্য এটুকু করা তো কর্তব্যই।

লাটুবাবুর এই কথায় আমার কান্না পেয়ে যায়। ধরা গলায় আমি বলি, আপনার জন্য আমি অনেক কিছু করবো লাটুবাবু। ঝিলিকের ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।

লাটুবাবু একটা বড় শ্বাস ফেলে বলেন, তোমার হাতেই দিয়েছি। ছেলেটা খুব গাড্ডায় পড়েছে, ওকে তুলে আনতেই হবে। ওরকম ব্রিলিয়াণ্ট একটা ছেলেকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

নিশ্চয়ই না লাটুবাবু। আমি পোঁ ধরলাম।

লীনা না কী নাম যেন বললে মেয়েটার!

লানাই।

তা তার যদি অত পতিত উদ্ধারের নেশা থেকে থাকে তবে রুদ্রাক্ষ কেন, তুমিই তো আছো।

কথাটা আমার মাথায় খেলেনি। আমি একটু থতমত খেয়ে গাড়লের মতো চেয়ে রইলাম।

লাটুবাবু বললেন, তোমার চেয়ে বিধ্বস্ত, অসহায়, আত্মবিশ্বাসহীন লোক সে আর কোথায় পাবে? শোনো রবি।

আজ্ঞে, শুনছি। বলুন।

লীনার কাছে গিয়ে এবার থেকে বরং নিজের কাঁদুনী একটু গেয়ো। ঠিক মতো যদি কেসটা পুট আপ করতে পারো তবে লীনা তোমাকে অ্যাকসেপট করবেই। তাতে তোমারও হিল্লে হবে, ঝিলিকেরও হিল্লে হবে।

যে আজ্ঞে। তাহলে ওই পনেরো হাজার না কত যেন বললেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, পাক্কা পনেরো হাজার। হার্ড ক্যাশ। ও নিয়ে ভেবো না। আমার কথার খেলাপ কখনো হয় না। আর শোনো, পরশু রুদ্রাক্ষদের বাড়ি থেকে ঝিলিককে দেখতে আসবে। তুমিও একটু থেকো।

আমি চোখের আনন্দাশ্রু গোপনে মুছে ফেলে বললাম, যে আজ্ঞে।

লাটুবাবু বিদায় নিয়ে যাওয়ার পরও আমি বহুক্ষণ সেই মহামানুষের গমনপথটির দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে চেয়ে রইলাম।

আমাকে চমকে দিয়ে দরজায় একটা মুশকোমতো লোক এসে দাঁড়ায়। আনমনা ছিলাম বলে, নইলে রাখালকে দেখে আমার চমকানোর তেমন কিছু নেই। রাখাল তো আজকাল খুনটুন করে না।

রাখাল গম্ভীরমুখে জিজ্ঞেস করে, ও লোকটা কে এসেছিল বলো তো?

একজন মহাপুরুষ।

রাখাল অবাক হয়ে বলে, কেমন চামার-চামার চেহারা।

ও কথা বলতে নেই রাখাল। আমি অর্থাৎ রবি সর্বজ্ঞ বিগলিত হয়ে বলে।

বউদি ডেকে বলল, দেখে আয় তো রবির ঘরে কে এসেছে। তাই এলুম। লোকটার তাহলে কোনো মতলব নেই বলছো।

আমি সম্মোহিতের মতো বলি, আছে। তবে তা মহৎ মতলব।

রাখাল বিরক্ত হয়ে বলে, তোমার কথাগুলো আজ যেন কেমন ধারা। তা শোনো, তোমাকে বলতে এলুম, ওদিকে কাজ কিন্তু ফতে হয়ে এসেছে। তান্ত্রিক কাল এসেছিল। আয়োজন টায়োজন সব

শেষ। কাল রাত বারোটায় সে এ বাড়ির ছাদে পুজোয় বসবে। পরশু শুরু হবে কাজ।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বলি, কী কাজ?

ন্যাকা সেজো না দাদাবাবু। সময় থাকতে তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। শুনলে না। এখন আর কারো কিছু করার নেই। এখন তান্ত্রিক বুঝবে আর তুমি বুঝবে।

বান কি খুব লাগে রাখাল?

লাগবে না? ভীষণ লাগে! লোকে ধড়ফড় করতে থাকে, মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরোয়, চোখের তারা উল্টে যায়। সে এক ভীষণ অবস্থা।

ওরে বাবা! বলে আমি ককিয়ে উঠি। একটা সুন্দর সকাল হঠাৎ যেন মেঘলা হয়ে যায়।

রাখাল হঠাৎ একটু সান্ত্বনার সুরে বলে, তবে তুমি একেবারে মরবে না দাদাবাবু। তোমাকে অন্যভাবে বাঁচিয়ে রাখারও একটা ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, সে আবার কিরকম?

রাখাল একগাল হেসে বলে, আসলে বউদির এক মামার খুব অসুখ। এখন তখন অবস্থা। সামনের অমাবস্যা কাটবে না বলে তান্ত্রিক গুনে বলে দিয়েছে।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কি? কিন্তু যদি আত্মা বদলে দেওয়া যায় তবে লোকটা আরো কিছুদিন টিকে যাবে। তাই ঠিক হয়েছে তান্ত্রিক তোমার আত্মাটাকে নিয়ে সেই মামার শরীরে ভরে দেবে। পুরোনো ভাড়াটেকে তুলে নতুন ভাড়াটে বসানোর মতো ব্যাপার আর কি।

বলো কী? আমার চোখ কপালে ওঠে।

তবে খারাপ হবে না। মামার বয়সটাই যা একটু বেশী। সত্তর টত্তর হবে। তবে টাকাপয়সা জোতজমি মেলা। অন্যের শরীরে

ঢুকতে যদি ঘেন্না না করো তবে শেষ জীবনটা সুখেই কাটাতে পারবে। তাছাড়া নিজের দাদার মামাশ্বশুর হওয়াটাই বা কম কী? কটা লোক হতে পেরেছে আজ অবধি?

কী করে আমি রাখালকে বোঝাবো যে, বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর হওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই? সেই বৃথা চেষ্টা না করে আমি অন্য একটি জটিল প্রশ্ন তুললাম, বুড়ো মানুষটাকে জোর করে বাঁচিয়ে রেখে লাভটা কী বলো তো রাখাল।

সে হল আপন মামা, আর তুমি হলে গিয়ে পরস্য পর নামমাত্র দেওর।

আমি মিন মিন করে বলি, তা বটে। কিন্তু প্রাণ বিনিময় হলে আমিই তো বউদির মামা হচ্ছি। আর মামা হবে গিয়ে দেওর।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, সে রকম বন্দোবস্ত হয়নি। তোমার প্রাণটা মামার শরীরে সেঁধোবে বটে, কিন্তু মামারটা আর তোমার শরীরে ঢুকবে না।

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলি, তা কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভাল?

রাখাল হিসেবী হাসি হেসে বলে, পৃথক ফল কি আর সাধে হয়? খরচ আছে না? মামার আত্মা তোমার শরীরে ঢোকাতে গেলে খরচ প্রায় ডবল দাঁড়াবে যে। বড়দাদাবাবুর তবু ইচ্ছে ছিল। বউদিই বেঁকে দাঁড়ালেন।

রাখাল চলে যাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ হতাশ হয়ে বসে থাকি। মাত্র পরশুদিন পর্যন্ত যার আয়ু, এই পৃথিবীতে তার আর কী করার থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি না। যে কোনো মহৎ কাজ করার পক্ষে সময়টা বড়ই কম। তাছাড়া মরতে আমার তেমন ইচ্ছেও করছে না।

তবে একটা কথা ভেবে আমার একটু ভালই লাগছিল। এই কাপুরুষ মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ববর্জিত রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার নিরন্তর

সহবাস শেষ হতে চলেছে। সে মরলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সহমরণে যেতে হবে বটে, তবু সে যে মরছে এটা বোধহয় পৃথিবীর পক্ষে একটা সুখবর।

আমার বেড়াল শহীদ সম্ভবত আমার শোকাহত অবস্থাটা টের পেয়ে কোলে উঠে বসে রইল। আমি আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলাম।

সর্বহারাদের যেমন শৃংখল ছাড়া আর কিছুই হারানোর ভয় নেই আমারও সে রকমই অবস্থা। এই ঘরখানার আশ্রয় ছাড়া আমারও আর বেশী কিছু হারানোর ছিল না। পৈতৃক বাড়ির এই ঘরখানাই যা আমার শৃংখল বা বন্ধন ছিল। লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেও হত। কিন্তু মুস্কিল হল, ওই লোটা কম্বলের কথায় সেই সাধুর বিখ্যাত গল্পটা এসে পড়ে। তার কৌপীন ইঁদুরে কাটত বলে লোকটা একটা বেড়াল পুষেছিল। তারপর সেই বেড়ালের দুধ যোগান দিতে এল গরু। গরু এল তো জরুই বা বাকি থাকে কেন। এইভাবে সাধুর বৈরাগ্যের বারোটা বেজেছিল। অবিকল একই অবস্থা আমারও। বড়দা মহীতোষ এবং বউদি খাবারে বিষ দিয়ে আমাকে মারবার চেষ্টা করছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আমি মতিবাবুদের বাড়ির সামনেকার খাটাল থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চাকে কুড়িয়ে আনি। বলতে কি, বেড়ালটা ছিল আমার গিনিপিগ। সেই জন্য আমি তার নাম রেখেছি শহীদ। আমার প্রাণ বাঁচাতে হয়তো বা তাকে প্রাণ দিতে হবে।

সেই শহীদ এখন আর কচি খোকা বা খুকুটি নেই। দিব্যি ডাগরডোগর প্রাপ্তবয়স্ক বা বয়স্কা হয়ে উঠেছে। বেড়ালদের সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার দরুন আমি আজও জানি না সে মাদী না হুলো। তার নামটি আমি পুংলিঙ্গাত্মক রাখলেও আমার প্রতি তার আচরণ অনেকটাই পুরুষের প্রতি নারীর মতো। সারাদিন উঞ্ছবৃত্তি করে ঘরে ফেরার পর আমাকে দেখলে শহীদের চোখে সবুজ দ্যুতি আরো উজ্জ্বল

হয়ে ওঠে। লেজটি শূন্যে নানান বিভঙ্গে ঢেউ ভাঙতে থাকে। তার মিহি ও মোলায়েম মিঁয়াও আওয়াজে সুরেলা ধা নি ধা নি এসে লাগে। আমার কোলে পিঠে উঠে নানাভাবে তার হর্ষ ও রোমাঞ্চ প্রকাশ করতে থাকে।

বেড়ালমাত্রই চোর, বিশ্বাসঘাতক ও নিমকহারাম বলে আমি শুনেছি। তবে তাদের কিছু সদগুণও আছে। তারা একবার যার বশ্যতা মেনে নেয় তাকে সহজে ছেড়ে যায় না। আমার অনুপস্থিতিতে সে সারাদিনই ঘর পাহারা দেয়। আমার ফিরতে দেরী হলে জানালায় বসে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় সে অবিরল করুণ থেকে করুণতর মিয়াঁও মিয়াঁও ডাকে বাতাস ভারী করে তোলে।

হায়, শহীদ জানে না, স্বীয় মৃত্যুভয়ে ভীত এই মেরুদণ্ডহীন আমি তাকে অগ্রদানীর মতোই ব্যবহার করেছি মাত্র। কিন্তু মুস্কিল তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অত সাদামাটা ও ব্যবহারিক থাকেনি। আস্তে আস্তে সম্পর্কের বদল ঘটেছে। ভীষণ বদল ঘটেছে।

আজকাল মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি কি শহীদকে ভালবাসি? সঠিক বুঝতে পারি না। তবে বাড়ি ফেরার সময় তার জন্য আজকাল আমি একটা অহেতুক আকর্ষণ বোধ করতে থাকি।

পরশুদিন আমার মৃত্যু ঘটবে অথবা আমি হয়ে যাবো আমার বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর। রবি সংজ্ঞর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর সেইদিন থেকেই শহীদ আবার রাস্তার বেড়াল হয়ে যাবে। নোংরা ঘাঁটবে, খেতে পাবে না, অন্য বেড়ালদের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হবে, গাড়ি চাপা পড়াও বিচিত্র নয়, দুষ্টু ছেলেরা ঢিল মারবে হয়তো। ভাবতে ভাবতে আমার চোখে জল আসার উপক্রম হল। আমিই যে তাকে একদিন মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসিয়ে রাখতাম তা ভুলে গিয়ে আমি শহীদের জন্য আজ একটু কাঁদলাম।

আরও অনেক কিছুর জন্যই আমার কান্না পেতে লাগল। খোড়ঘণ্ট

আমি বড় ভালবাসতাম। মরে গেলে আর থোড়ঘণ্ট খাওয়ার উপায় থাকবে না। একটা ডিজিটাল ঘড়ির বড় শখ ছিল। লাটুবাবু টাকা দিলে বাগড়ি মারকেট থেকে একদিন কিনে ফেলতাম ঠিক। কিন্তু মহাকালে যে লয় হতে চলেছে তার আর পার্থিব সময় কিংবা ঘড়ি দিয়ে কী হবে? রবি সর্বজ্ঞর খোলসের মধ্যে থেকে এতকাল আমি একটা তুচ্ছ জীবন যাপন করেছি বটে, কিন্তু আজ সেই তুচ্ছ জীবনটার জন্য প্রাণ আনচান করতে লাগল। বউদির মামা কি থোড়ঘণ্ট ভালবাসে? ডিজিটাল ঘড়ির কি কোনো শখ আছে তার? কালই যদি রাখালের হাত দিয়ে শহীদকে তার বাড়ীতে চালান করে দিই তাহলে লোকটা কী মনে করবে?

কাঁদার উপকারিতা অনেক। মনের ভার লাঘব হয়, চিন্তায় ভারসাম্য আসে, চোখের জলের সঙ্গে অনেক বীজাণুও বেরিয়ে যায়।

দুপুরে আমি লাটুবাবুর বাড়িতে হানা দিলাম।

লাটুবাবু, টাকাটা আপনি কবে দেবেন?

কেন বলো তো! বিয়েটা লাগলেই দিয়ে দেবো।

ততদিন আমি তো বাঁচব না।

বাঁচবে না? লাটুবাবু চোখ কপালে তুলে বলেন, বাঁচবে না মানে?

যদি নাই বাঁচি তাহলে টাকাটার কী হবে?

লাটুবাবু ভারী অবাক হয়ে বলেন, তোমার মরার কী হল বলো তো? সুইসাইডের কথা ভাবছো নাকি?

না, আমার অত সাহস নেই।

তাহলে কি কোনো জ্যোতিষী কিছু বলেছে?

না। তবে খুব শীগগীর আমার মৃত্যু হতে পারে। মানে, হবেই।

লাটুবাবু উদ্বেগ ও অস্বস্তির সঙ্গে বলেন, বলো কী? তাহলে যে ঝিলিকের বিয়েটাই কেঁচে যাবে! পাত্রটিকে বেশ খেলিয়ে তুলছিলে, হঠাৎ তোমার হল কী বলো তো? দর বাড়াচ্ছো নাকি!

আমি ম্লান একটু হেসে মাথা নেড়ে বলি, দর বাড়িয়ে লাভ নেই

লাটুবাবু। আমি দরাদরির অনেক উর্ধ্বে চলে যাচ্ছি।

লাটুবাবু খপ করে আমার হাত দু'খানা ধরে বলেন, দোহাই তোমার। মরতে হয় তো ঝিলিককে সাত পাক ঘুরিয়ে দিয়ে তারপর মোরো। আমার যদিও কষ্ট হবে, তবু তোমাকে না হয় আমি আরো পাঁচ হাজার বেশী দেবো। আর চাপাচাপি কোরো না। বিশ হাজারের বেশী আর এখন উঠতে পারবো না। মেয়ের বিয়ের খরচটাও তো জানো।

আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, আমার পক্ষে এই অল্প সময়ে যতটুকু সম্ভব তার সবই আমি করব লাটুবাবু! তবে বিশ হাজার টাকা বোধহয় আর দিতে হবে না আপনাকে। আপাতত পাঁচশো টাকা দিন।

কেন, পাঁচশো টাকা কেন?

দরকার আছে।

আমি বেশ হিসেব করে দেখেছি, পরশুদিনের মধ্যে ফেলে ছড়িয়ে খরচ করেও পাঁচশো টাকার বেশী আমি ওড়াতে পারব না।

লাটুবাবু ঝপ করে পাঁচশো টাকা দিয়ে ফেললেন। বললেন, জানি, খরচাপাতি আছে। এ-টাকাটা ঝিলিকের বিয়ের অ্যাকাউণ্টেই ধরে নিও। তোমার হিসেব আলাদা রইল।

অত হিসেব করতে আমার মন চাইছিল না। কী হবে হিসেব করে? আমার হিসেব নিকেশ শেষ হয়ে গেছে।

লাটুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি ট্যাকসি ধরে সোজা চলে আসি রুদ্রাক্ষর অফিসে।

এই যে রুদ্রাক্ষ!

হ্যালো সর্বজ্ঞ। বোসো। লীনাকে কেমন লাগল?

দুর্দান্ত। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

আচমকা এ রকম দুঃসাহসিক ঘোষণায় রুদ্রাক্ষ একেবারে বজ্রাহত হয়ে গেল। বিনা ভূমিকায়, প্রস্তুতি ছাড়া এ রকম একটা প্রস্তাব

করার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না.। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। মাত্র পরশুদিন পর্যন্ত আমার আয়ু। আমার কি ভূমিকা টুমিকা করা সাজে? রুদ্রাক্ষর দুই চোখ দুটি রসগোল্লার মতো গোল দেখাতে লাগল। তারপর চোখ পিটপিট করে সে আমাকে আরো কিছুক্ষণ লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল, আর ইউ সিরিয়াস?

ভীষণ। একটুও দেরী করতে আমি রাজি নই।

রুদ্রাক্ষ হঠাৎ চেয়ারটা ঠেলে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, হিয়ার ইজ এ হিরো। হিয়ার ইজ এ সেলফ স্যাক্রিফাইসিং ম্যান। হিয়ার ইজ এ ম্যান উইথ ম্যাগনিফিসেণ্ট কারেজ! কংগ্র্যাচুলেশনস সর্বজ্ঞ। ইন ফ্যাকট নিজে মরে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো।

তার মানে?

আগে বোসো। কফি খাও। বলে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে রুদ্রাক্ষ বলে, কফি? না কি বিয়ার! না থাক, তোমার আবার মদে অ্যালার্জি, তবে ঘটনাটা এতই মহৎ যে, মদ ছাড়া সেলিব্রেট করা উচিত নয়।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, কফি।

আচ্ছা কফি। বলে বেয়ারাকে ডেকে কফি আনার কথা বলে রুদ্রাক্ষ একটা সিগারেট ধরায়। তাকে ভারী খুশি ও ভারমুক্ত দেখাতে থাকে। খুশিয়াল গলায় সে বলে, গ্র্যাণ্ড হোটেলে তোমার আর লীনার ঘনিষ্ঠতা দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। সেই সন্দেহটা আরো স্ট্রং হল যখন বাড়ি ফেরার সময় লীনা তোমার খোঁজ খবর নিচ্ছিল। তুমি ওকে দারুণ ইমপ্রেস করেছো। লীনা বলছিল, সর্বজ্ঞর মতো এ রকম অসহায় সর্বহারার মতো মুখ আমি আর দেখিনি। পৃথিবীতে যেন ওর কেউ নেই, কিছু নেই।

বলছিল? আমি নড়েচড়ে বসি।

হ্যাঁ, সারাক্ষণই তোমার কথা। শুনতে শুনতে আমার এক সময়ে

মনে হচ্ছিল, লীনা যেন আমার চেয়েও তোমাকে বেশী প্রেফার করছে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, তার মানে কি আমিই বেশী বিধ্বস্ত ?

তাই তো মনে হচ্ছে। যাক বাবা, ইট ইজ এ গ্রেট রিলিফ। এ ভেরি গ্রেট রিলিফ।

আমি আস্তে করে দাবার ছকে আর একটা কূট চাল দিয়ে বলি, শোনো রুদ্রাক্ষ, আমি যে লীনাকে বিয়ে করতে চাইছি তা কেন জানো ?

সে তো জানা খুব সোজা। ইউ আর বোথ ইন লাভ।

আমি মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলি, না রুদ্রাক্ষ, সেটা যে সত্যি কথা নয় তা তুমিও জানো। লীনার মতো হার্ড হেডেড সোশ্যাল ওয়ারকারকে ভালবাসা খুব সোজা কাজ নয়। বিশেষ করে তিনবারের ডিভোর্সীকে।

রুদ্রাক্ষর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তাহলে কেন ?

আমি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলি, স্রেফ তোমার জন্য রুদ্রাক্ষ। আমি তোমাকে বাঁচানোর জন্যই এই ডিসিশন নিয়েছি। কিন্তু একটি শর্ত আছে।

রুদ্রাক্ষ সতর্ক গলায় বলল, শর্ত। শর্ত কিসের ?

আমার একটি চেনা মেয়ে আছে। দারুণ সুন্দরী। গ্র্যাজুয়েট। তাকে তোমার বিয়ে করতে হবে। অনেক দেবে থোবে তারা। নগদ, জিনিসপত্র।

রুদ্রাক্ষ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালে। এ তো খুব সোজা কাজ। তোমার বান্ধবীটিকে বিয়ে করা একটা কর্তব্যও বটে। একজন সেলফ স্যাক্রিফাইসিং লোকের জন্য এটুকু করা কিছুই না সর্বজ্ঞ। কিন্তু এখন প্রচুর মদ না খেলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারব না আমার জন্য তোমার এই আত্মত্যাগ কেন।

মদ খেলেও বুঝতে পারবে না রুদ্রাক্ষ। কারণটা অনেক জটিল ও গভীর। এনিওয়ে তুমি আমাকে কথা দিচ্ছো ?

দিচ্ছি। কী দেবে কিছু জানো? ধরো ক্যাশটা কত।

ত্রিশ হাজার।

সোনা?

তাও প্রায় চল্লিশ ভরি। লাখ টাকার কিছু বেশীই খরচ করবে।

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে রুদ্রাক্ষ বলে, ডাওরি সিস্টেমটা আমি খুব অপছন্দ করি। তবু কথাটা তুলতে হল বাবার জন্য। হি ইজ অ্যান ওল্ড টাইমার। দানসামগ্রীর ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড বেশী মাথা ঘামায়। অবশ্য দোষও নেই। আমাকে মানুষ করতে বাবার অনেক খরচ হয়েছে।

আমি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে বলি, ওটা কোন ব্যাপার নয়।

নগদটা কত বললে?

ত্রিশ হাজার।

ওটা পঞ্চাশে তোলা যায় না?

যায়।

দেন ইট ইজ এ প্রমিস।

থ্যাংক ইউ। মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু জানতে চাও?

কফি এসে গেছে। কাপে একটা চুমুক দিয়ে রুদ্রাক্ষ বলল, আর জানার কী আছে? ইফ শী ইজ প্রেজেণ্টেবল টু দি হাই সোসাইটি দেন ইট ইজ অলরাইট। আমি যে জীবন যাপন করি সর্বজ্ঞ, তাতে বউ-টউয়ের তো কোনো ভূমিকা নেই। সারা দিনে এক আধবার দেখা হবে হয়তো। কিংবা তাও হবে না। আফটার এ হার্ড ডে'জ ওয়ারক আমি সন্ধেটা কাটাব কোনো বার-এ কিংবা পার্টিতে। আমার বউ যাবে তার ক্লাবে বা সোসাইটিতে। উই উইল লীড সেপারেট লাইভস। কেউ কারও ব্যাপারে ইণ্টারফিয়ার করব না। সুতরাং বেশী বাছাবাছি করে লাভ কী? হয়তো বনবেও না বেশীদিন। মেয়েটা কে?

আমার চেনা।

বোন টোন নয় তো?

না, ঠিক তা নয়।

রুদ্রাক্ষ খুব নরম গলায় বলে, বোন টোন হলে বলব, ইট ইজ নট এ ওয়াইজ ডিশিসন। আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটা এক ধরনের হঠকারীতাই হবে সর্বজ্ঞ।

সেটা আমি কতকটা টের পাচ্ছি রুদ্রাক্ষ। তবু পাত্রীর বাবারা তোমার জন্য পাগল।

রুদ্রাক্ষ চোখ পিটপিট করে বলে, কথাটা ঠিক। কিন্তু হঠাৎ পাত্রীর বাবাদের মধ্যে রিসেণ্টলি একটা পাগলামীর ছোঁয়াচ লাগল কেন বলো তো! সর্বত্রই আমি দেখতে পাই পাত্রীর বাবারা খুব অদ্ভুত ধরনের বিহেভ করছে?

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, সে কী!

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে রুদ্রাক্ষ বলে, সকাল থেকেই আমাদের বৈঠকখানায় তারা জড়ো হতে থাকে। আমি অফিসে বেরোনোর সময়েও দু'চার জনকে গেটের কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখি। অফিসে ঢুকবার মুখেও কয়েকজনকে দেখা যায়। অফিস থেকে যখন বেরোই তখনও দেখতে পাই, রিসেপশনে বা দারোয়ানের টুলে চোর চোর মুখ করে বসে আছে সব। টেলিফোনে সারা দিন তারা আমাকে জ্বালাতন করে। টাকা সাধে, গাড়ি বাড়ি সাধে।

সাধে?

খুব সাধে। আই গট বিগ অফারস ফ্রম দেম।

কত বড় অফার?

রুদ্রাক্ষ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তুমি ওটা নিয়ে ভেবো না। আমি তোমার সেই চেনা মেয়েটিকেই বিয়ে করব। ক্যাশটা কত বলেছিলে?

ত্রিশ ছিল, পঞ্চাশে তুমিই তুলেছ।

ওটা যেতে দাও। পঞ্চাশই থাক। পাত্রীর বাড়িটাড়ি নেই?

তার বাবার আছে। বোধহয় তাও দেবে।

দেবে আর ইউ সিওর? আমি চাইছি না। কিন্তু যদি দেয়ই তাহলে ইট শুড প্রেফারেবলি বি ইন সাম পশ এরিয়া। ধরো লাউডন বা ক্যামাক স্ট্রীট। বালীগঞ্জেও আপত্তি নেই। ওনারশীপ ফ্ল্যাট হলেও হয়।

হয়ে যাবে রুদ্রাক্ষ।

ফ্ল্যাট হলে একটু বড় হওয়াই ভাল। মিনিমাম বারো শ' স্কোয়ার ফুট।

সেটাও বাধা হবে না।

লীনার ভার তাহলে তুমিই নিচ্ছো?

যদি লীনা আমার ভার নিতে চায় রুদ্রাক্ষ।

হাঃ হাঃ করে ঘর ফাটিয়ে হাসল রুদ্রাক্ষ। মাথা নেড়ে বলল, নেবে না? বলো কী? লীনা দু'হাত বাড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ইন ফ্যাকট কাল তোমাকে যতটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল আজ তার চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে। একস্ট্রিমলি ক্রেস্টফলন। তোমার শরীর-টরীর ভালো তো সর্বজ্ঞ?

ভাল, খুব ভাল।

ফ্যামিলিতে কোনো ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটে নি তো?

না। আমার ফ্যামিলি বলতে কিছু নেই।

বাঃ। লীনার পক্ষে এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কে হতে পারে? দাঁড়াও ওকে একটা টেলিফোন করি।

আমি এ প্রস্তাবে বাধা দিই না।

রুদ্রাক্ষ টেলিফোনে কথা বলতে থাকে, হ্যালো লীনা! আরে কী খবর? কাল ঠিকমতো বাড়ি ফিরতে পেরেছিলে তো? কোনও অসুবিধে হয় নি?···আমি? না, আমি এক্সট্রিমলি ড্রাংক অবস্থাতেও রোজ ঠিক ফিরে যাই। ইট ইজ এ হ্যাবিট।···আরে শোনো,

সর্বজ্ঞকে নিশ্চয়ই তুমি এক রাত্রে ভুলে যাও নি?…হাঃ হাঃ, সারা রাত ওর কথা ভেবেছো! স্ট্রেঞ্জ!…ভুলতে পারছো না! তাতে কী? সর্বজ্ঞও তোমাকে ভুলতে পারছে না। আর পারছে না বলেই আমার অফিসে এসে হাজির হয়েছে। কথা বলবে একটু? ভারী খুশি হবে ছেলেটা।

রুদ্রাক্ষ রিসিভারটা এগিয়ে দেয়। আমি নিস্তেজ হাতে সেটা নিই এবং কানে ঠেকাই।

লীনার মোহময় স্বর আমাকে আক্রমণ করে, সর্বজ্ঞ?

বলছি লীনা।

তুমি কেমন আছো?

আমি ভাল নেই লীনা।

তোমাকে তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে করলে না তো!

না, বরং আশায় আনন্দে মনটা নেচে উঠল।

ওঃ, ইউ নটি বয়। তুমি কেন ভাল নেই বলো তো! কী হয়েছে?

আমার ভাল থাকার যে কথাই নয় লীনা। আমার বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, চাকরি নেই, সম্পত্তি বেহাত। আজ বেঁচে আছি, কালই হয়তো থাকবো না। কে জানে।

ছিঃ, ও-রকম বলতে নেই।

আমার কোনো আপনজনও নেই লীনা। একে কি বেঁচে থাকা বলে?

যার কেউ নেই তার আমি আছি।

তুমি আছো?

আছি।

তাহলে রুদ্রাক্ষর কী হবে?

রুদ্রাক্ষর চেয়েও তুমি অনেক বেশী বিধ্বস্ত, অনেক বেশী অসহায়। তোমার মতো এমন অভিভাবকহীন, অরক্ষিত, উদ্দেশ্যহীন মানুষ তো রুদ্রাক্ষ নয়। কাল সারা রাত আমি শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

কতবার যে কান্না পেয়েছে ভাবতে ভাবতে।

তাহলে আমরা এখন কী করব লীনা?

কেন, বিয়ে করব। সারা রাত ধরে ভেবে আমি আজ ভোরবেলায় ডিসিশন নিয়েছি। একজন শক্তসমর্থ, প্রাণবন্ত, হৃদয়বতী মহিলার আশ্রয় ছাড়া তোমার চলবে না। মুস্কিল হচ্ছে বাবাকে নিয়ে।

কেন, মুস্কিল কিসের?

এই বার বার বিয়ে এবং ডিভোর্স বাবা একদম পছন্দ করছে না। বাবা চায়, চতুর্থ বিয়েটা যাতে আমি না ভাঙি। হি ওয়ান্টস এ পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট। জানো তো, আমার বাবা রুদ্রাক্ষর সুপ্রিম বস।

জানি।

আর এও তো জান, রুদ্রাক্ষ দারুণ ব্রিলিয়াণ্ট।

জানি।

তাই বাবা চাইছে আমি রুদ্রাক্ষকে বিয়ে করে সারা জীবন তার বউ হয়ে থাকি।

কিন্তু তোমার মহৎ উদ্দেশ্যটার কথা কি উনি জানেন?

জানে। তবে বলেছে, মহৎ উদ্দেশ্যে গুলি মারো। ভ্যাগাবণ্ডদের আর বিয়ে করা চলবে না।

উনি কি জানেন যে, রুদ্রাক্ষ মদ খায়?

ওমা! জানবে না কেন? বাবার সঙ্গে বসেও তো খায়।

উনি কি জানেন যে, রুদ্রাক্ষ ঘুঁষও খায়?

না জানার কথা নয়।

রুদ্রাক্ষ যে মিথ্যে কথা বলে তাও কি জানেন?

খিলখিল করে হেসে লীনা বলে, রুদ্রাক্ষ তো ছেলেমানুষ, আমার বাবা নিজেই সারাদিনে একটাও সত্যি কথা বলে না। ওভাবে বাবাকে ঠেকানো যাবে না সর্বজ্ঞ।

আমি অসহায়ভাবে বলি, তাহলে উপায়?

আমি অবশ্য বাবাকে বলেছি, আর একটা বিয়ের চানস দাও। এই শেষ বিধ্বস্ত লোকটাকে উদ্ধার করার পরই তাকে ডিভোর্স করে রুদ্রাক্ষকে বিয়ে করব।

আমি আতংকিত হয়ে বলি, না!

মিহি গলায় একটু বিস্ময় ফোটে লীনার, না কেন সর্বজ্ঞ? আর ইউ জেলাস?

ঠিক তা নয় লীনা। আমি জানি রুদ্রাক্ষ পাত্র হিসেবে ভাল নয়।

সেটা আমিও জানি। কিন্তু উপায় কী সর্বজ্ঞ?

তোমার বাবা কি তোমাকে চানস দিতে রাজি হয়েছেন লীনা?

না। বাবা তো কখনো সমাজসেবা করেনি। এইসব সৎ কাজের অর্থ তার বোঝার কথা নয়। বাবার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক তফাৎ। যে-রুদ্রাক্ষকে বিধ্বস্ত বলে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম বাবা অতি সুপাত্র ভেবে তারই সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছে।

তাহলে কী হবে লীনা?

বাবার কথা আমি কখনো শুনিনা সর্বজ্ঞ। তুমি ভেবোনা।

আমি নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বলি, তাহলে ওই কথাই রইল লীনা!

ওই কথাই রইল সর্বজ্ঞ।

টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার পর তাকিয়ে দেখলাম রুদ্রাক্ষ আমার দিকে অতিশয় গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে যেন বা ভূত দেখছে। ভূত দেখতে দেখতে সে অবিশ্বাসের গলায় বলল, টেলিফোনে তুমি লীনাকে কী বললে যেন। পাত্র হিসেবে আমি খুব খারাপ না কী যেন!

আমি ময়লা রুমালে মুখটা একটু মুছে নিয়ে বললাম, এ কথায় তোমার রাগ করা উচিত নয় রুদ্রাক্ষ। ও কথাটা আসলে ডিপলোম্যাসি। যাতে লীনা তোমার প্রতি খুব বেশী ঝুঁকে না পড়ে।

রুদ্রাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করতে চাই সর্বজ্ঞ।

তার মানে?

রুদ্রাক্ষ মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে বলল, আমি মদ খাই, ঘুঁষ খাই, মিথ্যে কথা বলি। লোক হিসেবে আমি খুবই খারাপ। তোমার কোন চেনা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিওনা সর্বজ্ঞ।

আমি বিপাকে পড়ে বলি, তাহলে লীনাকেও আমি বিয়ে করতে পারব না রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ঠিক আছে, তোমার সেই চেনা মেয়েটিকেই বিয়ে করব না হয়। তবে ক্যাশটা আরো দশ হাজার বাড়িয়ে দাও।

আমি কয়েক সেকেণ্ড বিস্ময়ে কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি ত্রিশকে ষাটে তুলেছো রুদ্রাক্ষ। আলটিমিটলি সেটা কোথায় উঠবে বলো তো? কোনো সিলিং নেই?

রুদ্রাক্ষ একটু লজ্জার হাসি হেসে বলে, দেয়ার ইজ হট্ বিডিং ইন দি মারকেট। গতকালও আমার দর উঠেছিল এক লাখ। তবে মেয়েটা কালো এবং ট্যারা। তোমার কেসটা অবশ্য আলাদা। ইউ আর এ গ্রেট ফ্রেণ্ড। তাই তোমার ক্ষেত্রে আমি বেশী চাপাচাপি করছি না।

আমি উদাস গলায় বলি, টাকা আমি দেব না রুদ্রাক্ষ। দেবে পাত্রীর বাবা। তবু বলি, একটা সিলিং থাকা ভাল।

রুদ্রাক্ষ হাতটা নেড়ে বলল, ঠিক আছে সর্বজ্ঞ। মেক ইট সেভেনটি থাউজ্যাণ্ড, অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ ফাইন্যাল। সাত সংখ্যাটাও খুব পয়া। আমার নামের বাংলা অক্ষরের সংখ্যা সাত। রুদ্রাক্ষ সেনগুপ্ত। কত হয়? সাত না!

সাত। আমি কড় গুণে বলি।

দেন সেভেনটি থাউজ্যাণ্ড ইজ ফাইন্যাল। তবে একটা কথা বলে রাখা ভাল সর্বজ্ঞ।

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বলি, কী কথা?

মেয়েটির যদি কোনো ডিফেকট থাকে তাহলে কিন্তু সিলিং আমার বাবা মানবে না।

কী ডিফেকট থাকবে?

ধরো রং তত ফর্সা নয় বা নাকটা একটু চেপ্টা বা হাইট খুব বেশী বা কম কিংবা গলার স্বর তত মোলায়েম নয়, এইসব আর কি। সেসব ক্ষেত্রে আমার বাবা প্রতিটি ডিফেকটের জন্য আলাদা আলাদা কমপেনসেশন চাইতে পারে। ওই পুরুতরা যেটাকে "মূল্য ধরে দেওয়া" বলে আর কি।

আমি বুঝলাম। মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক আছে রুদ্রাক্ষ, তাই হবে।

কিছু মনে করো না সর্বজ্ঞ। বাবা একটু সেকেলে।

আমি লাটুবাবুর জন্য একটু ভাবিত হয়ে পড়ি। ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে তাতে লাটুবাবু ঝিলিকের বিয়ে দিতে কোমরভাঙা দ না হয়ে যান। রুদ্রাক্ষ যাতে আর দর না বাড়াতে পারে তার জন্য আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলি, আজ চলি রুদ্রাক্ষ।

এসো সর্বজ্ঞ। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।

বাইরে বেরিয়ে আমি লাটুবাবুকে ফোন করলাম।

লাটুবাবু!

বলো রবি।

বিয়ে পাকা।

বলো কী? অ্যাঁ! তুমি তো দুর্দান্ত ছেলে দেখছি।

আমি একটা শ্বাস ফেলে বললাম, হ্যাঁ, আমি যে এতটা দুর্দান্ত তা আমিও জানতাম না। তবে বিয়েতে আপনার কিছু খরচ আছে।

কিছু শুনলে টুনলে?

শুনলাম। নগদ সত্তর হাজার।

কত বললে? আবার বলো।

সত্তর হাজার।

দাঁড়াও। টেলিফোনটা বোধহয় গড়বড় করছে। ভাল বুঝতে পারছি না।

টেলিফোন ঠিকই আছে লাটুবাবু।

তবু একটু ধরো। বাঁ দিকের বুকটা একটা চিড়িক দিয়ে উঠল যেন।

এখনই ঘাবড়াবেন না। আরো আছে। কলকাতার ভাল পাড়ায় একটা বাড়ি বা বড় ফ্ল্যাট দিতে হবে। দু আড়াই লাখ ধরে রাখুন।

নাঃ। বুকটা বাস্তবিকই চিড়িক দিচ্ছে। হার্টটা ঠিক কোথায় থাকে বলো তো! বাঁ দিকে না!

বাঁ দিকে। বোঁটার দু ইঞ্চি নীচে।

এখানেই চিড়িকটা দিচ্ছে। খুব জোর চিড়িক হে।

তবে একটা ভাল খবরও আছে। সোনার পরিমাণটা বাড়ায়নি, গাড়ি বা এরোপ্লেনও চায়নি। আপনি কি তবু রাজি আছেন লাটুবাবু?

লাটুবাবু একটা শ্বাস ফেলে বলেন, এই পাত্র ছাড়া চলবে না।

তাহলে যোগাড়যন্ত্র করতে থাকুন।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে আমি পয়সা দিয়ে দিই এবং রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।

বিশাল এই শহরটা আজ আমার চোখে খুবই ফাঁকা ও অর্থহীন লাগছিল। পরশুদিন যার মৃত্যু অবধারিত তার চোখে অবশ্য ফাঁকা লাগারই কথা।

॥ আট ॥

রাত্রিবেলা চুপি চুপি রাখাল এসে হাজির। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। হেসে বলল, কী ছোটবাবু, কেমন বুঝছো?

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, ভাল বুঝছি না।

ভাল বুঝবার কথাও নয়। দু পাঁচশো টাকা খরচ করলে এই দুর্গতি হত না। তা দুর্গতি যতই হোক এই দুটো দিন খুব ভাল খাবার দাবার হবে তোমার জন্য। আজ রাতে বউদি নিজে তোমার জন্য বিরিয়ানি রাঁধছেন। বার বার বলছেন, ছেলেটা বড় গোবেচারা ছিল, কারও সাতে পাঁচে থাকত না।

বলছে?

তা একটু মন খারাপ সকলেরই হয় বৈকি।

আমারও হচ্ছে রাখাল। আমার মরতে ইচ্ছে করছে না।

কারই বা করে বলো ছোটোবাবু। তবে মরতে তো সকলকেই হয়। দুদিন আগে বা পরে।

আমি ক্ষীণ স্বরে বলি, আমি না হয় দুদিন পরেই মরতাম।

আহা, ভাবছো কেন। একেবারে তো আর মরছো না। বউদির মামা হয়ে দিব্যি থাকবে। বরং আসল মরা তো মরছে বউদির মামা। সে কথাটাও একটু ভাবো। তার কষ্ট তোমার চেয়ে ঢের বেশী।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করি, বউদির মামা কি থোড়ঘণ্ট খেতে ভালবাসে রাখাল?

রাখাল চোখ বড় বড় করে বলে, কেন বলো তো?

আমি থোড়ঘণ্ট খুব ভালবাসি। আর শোনো রাখাল, বউদিকে বোলো যেন তার মামাকে একটা ভাল ডিজিটাল ঘড়ি কিনে দেয়।

কী ঘড়ি বললে ?

ডিজিটাল ঘড়ি। তুমি বুঝবে না, শুধু নামটা মনে রেখো। আমার বড় শখের জিনিস।

আর কিছু ?

আর আমার এই বেড়ালটাকে ওই মামার বাড়িতে পৌঁছে দিও। আমি মরলে তো ওকে কেউ দেখার থাকবে না।

রাখাল মুখে একটু চুকচুক শব্দ করে বলল, এঃ, তুমি বড্ড লাতন হয়ে পড়েছো দেখছি। উল্টোপাল্টা বকতে লেগেছো। এক কাজ করো, একটা পাঁইট চাপান দিয়ে নাও, অনেক ভাল লাগবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না রাখাল, আমি কখনো মদ খাইনি। আমার বংশে কেউ ওসব খায় না।

ওসব কথা রাখো তো। বলে নিজেই উঠে রাখাল গিয়ে আগের দিনের মতোই কী একটু কলকাঠি নেড়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা আস্ত বোতল আমার সামনে এনে রেখে বলল, চালিয়ে দাও।

মদ খেলে নেশা হয় রাখাল।

এখন নেশাই তো চাই। দেখবে ভয়ডর সব কেটে যাবে।

বলে রাখাল বোতলটা খুলে গেলাসে খানিক ঢেলে জলটল মিশিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, মদ নয় ওষুধ বলে খাও। মানুষ যখন নির্জীব হয়ে পড়ে তখন ডাক্তাররা ব্র্যাণ্ডি খাওয়ায়, জানো না ? খাও। খেলে দেখবে বিরিয়ানির স্বাদটাও জিবে খোলতাই হবে।

আমি একটু খাই। বিদঘুটে গন্ধ আর ঝাঁঝালো স্বাদটা আমি তেমন টের পাই না। বরং জলের মতোই নির্দোষ লাগে। আমি ঢকঢক করে অনেকটা খেয়ে ফেলি। আমার বংশে এই বোধহয় প্রথম কেউ মদ খেল। কিন্তু মদ খাওয়া কি একে বলে ? আমি সাঁ করে গেলাস শেষ করে রাখালের হাত থেকে বোতলটা প্রায় কেড়েই নিয়ে বলি, না-হে, জল মেশালে চলবে না।

রাখাল আমার এই কাণ্ড দেখে হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, ওরে বাবা, তুমি যে এ লাইনে একেবারে অগস্ত্যমুনি! ছোটো-বাবু, মাইরি তোমার এত এলেম!

আমি বোতলটা শেষ করে গম্ভীর হয়ে বলি, আর একটা বোতল আনো।

রাখালের চোখে পলক পড়ছিল না। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে রুদ্ধ আবেগে। হাতের পিঠে চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলল, এমন ক্ষণজন্মা মানুষকে বাণ মারতে আছে! ছিঃ ছিঃ!

আমি তাড়া দিয়ে বললাম, কী হল? আনো।

আনছি ছোটোবাবু, আনছি। তুমি তো মানুষ নও, মহাপুরুষ। বলতে বলতে গিয়ে রাখাল আর একটা বোতল নিয়ে এল।

আমি সেটাকেও উড়িয়ে দিলাম। নেশা হোক চাই না হোক, পেটটা ভরে ঢোল হয়ে গেল। আমি বালিশে মাথা রেখে আধঘুমন্ত গলায় বললাম, দরজাটা ভেজিয়ে চলে যাও।

রাখাল বিড় বিড় করে কী যেন বলছিল। ভাল শুনতে পেলাম না। গভীর এক ঘুম এসে কোলে তুলে নিল আমাকে।

রাত্রিবেলা আমার ছোড়দা যীশুতোষ এসে হাজির। সারা গা ভিজে সপ সপ করছে। লম্বা চুল বেয়ে জলের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, দড়িতে গামছা আছে, ভাল করে গা মোছো। নইলে মেঝে ভিজে কাদা-কাদা হবে। আমার তো ঘরদোর নিকোনোর ঝি নেই।

যীশুতোষ কথাটাকে আমল না দিয়ে বলল, মরতে চলেছিস তবু এসব জাগতিক চিন্তা কেন রে? এ ঘর আর ক'দিন ভোগ করবি?

তা বটে, তবু ভেজা মেঝে আমি একদম সইতে পারি না।

দুনিয়ায় যে কিছুই তোর নয়, কারো নয় এই শিক্ষাটা আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল।

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, হয়ে লাভটা কী হল বলো। খামোখা গঙ্গায় ডুবে একপেট জল খেয়ে দমবন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে মরলে। শিক্ষাটা দেরীতে হলে আরো ক'দিন বাঁচতে।

যীশুতোষ আমার কাঠের চেয়ারখানায় বসে ছুটো হাঁচি দিয়ে বলল, মৃত্যুটা কিছুই নয়, অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। আমি তোকে সেই কথাটাই বোঝাতে এসেছি।

আমি উদাস গলায় বললাম, শুধু শুধু কষ্ট করা। এসব কথা তো পুঁথিপত্রেও লেখা আছে। কাঠের চেয়ারটা কিন্তু ভিজে যাচ্ছে ছোড়দা। পালিশ উঠে গেলে আবার পালিশ করানোর পয়সা আমার নেই।

যীশুতোষ বাস্তবিকই আমার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আরো ছুটো হাঁচি দিয়ে মেঝেয় শিকনি ঝেড়ে বলল, তোর এখনও মায়া কাটেনি। আজ বাদে কাল যাকে আদরের শরীরটাই ছাড়তে হবে তার অত মায়া কেন রে? আরো ছুটো হাঁচির বাধা পার হয়ে যীশুতোষ বলল, তোর কাছে কোল্ডারিন ট্যাবলেট নেই? সর্দিটা বড় জ্বালাচ্ছে।

ভেজা গায়ে থাকলে সর্দি লাগবেই। তখন থেকে বলছি গাটা ভাল করে মোছো। শুনছো না।

দূর বোকা। এ জল কি মুছলেই যায়? মোছার অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, যতই মুছি না কেন, গা ভেজাই থাকে। জলে ডুবে মরছিলাম তো, সেই শেষ অবস্থাটাই কনটিনিউ করছে। সর্দিটাও সেই থেকে।

আমার একটু মায়া হল। বললাম, ব্র্যাণ্ডি খাবে? অনেক আছে।

যীশুতোষ মাথা নেড়ে বলল, না। জীবনে কখনো মদ খাইনি, মরার পর খাওয়ারও কোনো মানে হয় না। তারপর, তোর কী খবর বল। পরশু তোর ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে তাহলে।

আমি বিরস মুখে বললাম, তাই বা হচ্ছে কোথায়? আমার আত্মাটাকে নাকি বউদির এক বুড়ো মামার শরীরে চালান দেওয়া হবে।

হাঃ হাঃ করে খুব হাসল যীশুতোষ।

হাসছো কেন ছোড়দা?

খুব মুস্কিলে পড়বি। লোকটাকে আমি চিনতাম। এক নম্বরের কেপ্পন। ভাল করে খায় না, পোশাক পরে না। অথচ টাকার আণ্ডিল। ওর শরীরে ঢুকে খুব কষ্টে কাটবে তোর।

আমি একটু আশ্বাস্বিত হয়ে বলি, আমি কেপ্পন হবো না। টাকা ওড়াবো।

সে এখন বলছিস। বউদির মামা হলে তখন আর বলবি না। আত্মার বদল ঘটলে কী হয়, স্বভাব তো আর পাল্টায় না। কাঁচা মুগ সেদ্ধ আর ফ্যানসা ভাত ছাড়া লোকটা আর কিছু খায় না।

বলো কী? আমি চিন্তিত হয়ে বলি।

জীবনে হেঁটো ধুতি ছাড়া আর কিছু পরেনি।

ও বাবা!

উনিশশো উনিশ সালে একজোড়া কাঠের খড়ম কিনেছিল, সেইটে এখন ক্ষয় হয়ে কাগজের মতো পাতলা হয়ে এসেছে। সেইটে ছাড়া বুড়োটার আর কোনো জুতোও নেই।

আমি কখনো খড়ম পরিনি। শুনেছি ভারী শক্ত জিনিস।

এবার পরবি। তবে জীবনধারণটাই তোর এত শক্ত হয়ে দাঁড়াবে যে খড়মটার শক্ত ভাবটা আর টের পাবি না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যীশুতোষ ফের কয়েকটা হাঁচি দিয়ে মেঝেয় শিকনি ফেলল।

দৃশ্যটা দেখব না বলে চোখ বুজে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাণ মারলে কি খুব লাগে ছোড়দা?

যীশুতোষ বলল, তা আমি কী করে বলব? লাগারই কথা।

তবে আমার অভিজ্ঞতা নেই। জলে ডুবে মরতে কেমন লাগে তা যদি জানতে চাস তাহলে বলতে পারি।

নাঃ, তা জেনে কী হবে বলো। আমি তো মরবো বাণে।

যীশুতোষ একটু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মরা নিয়ে কথা, তা যাতেই হোক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? মরার সময় একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তারপর আর খারাপ লাগে না। কোনো প্রবলেম্ নেই, কাজকর্ম নেই, বেশ লাগে।

তুমি তাহলে ভালই আছো?

খুব ভাল। জ্যান্ত অবস্থায় এত ভাল কোনোদিন ছিলাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তোমার মতো যদি আমারও হত। গণ্ডগোল পাকাল বড়দার ওই মামাশ্বশুরটা। মরেও শান্তি নেই। বেগার খাটতে অন্যের হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কাঁচা মুগের ডাল বা খড়ম কোনটাই আমার পছন্দ নয়।

যীশুতোষ দমাস করে আর একবার হেঁচে নিয়ে বলে, বলতে ভুলে গেছি, লোকটার ভগন্দর আর হাঁফানী আছে। সেই কষ্টটাও ভোগ করতে হবে রে।

সর্বনাশ!

পিঠে একটা একজিমার কথাও শুনেছিলাম যেন।

ওরে বাবা!

সবই সয়ে যাবে। লোকটার অ্যাডভানটেজগুলোও তো দেখবি। ব্যাংকে অত টাকা।

কিন্তু কৃপণ যে।

তা হোক, টাকা ব্যাংকে থাকলেও অনেকটা জোর হয়।

আমি টাকা চাই না।

যীশুতোষ আমার দিকে কঠিন এক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, রবি, আমি যতদূর জানি, তুই রবি সর্বজ্ঞ হয়েও থাকতে পছন্দ করিস না।

আমি মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বলি, সে অবশ্য ঠিক।

তুই রবি সর্বজ্ঞকে ঘেন্না করিস, তাই না?

তা করি বটে।

তাহলে রবি সর্বজ্ঞ হয়ে বেঁচে থাকতে চাস কেন?

এ কথার জবাব হয় না। তবু মরীয়া হয়ে বলি, কিন্তু রবি সর্বজ্ঞরও কিছু অ্যাডভানটেজ আছে। রবির বয়স সত্তর নয়। মাত্র আটাশ। তার অর্শ, ভগন্দর বা একজিমা নেই। সে খড়ম পরে না বা কাঁচামুগের ডালও তাকে খেতে হয় না।

আর ডিস অ্যাডভানটেজগুলোর কী হবে? তোর টাকা নেই, বাড়ি হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। তোর আত্মবিশ্বাস নেই। তুই ভীতু, আহাম্মক, বোকা। বেঁচে যদি থাকতেই হয় তবে রবি সর্বজ্ঞ হয়ে বেঁচে থাকার মানেই হয় না।

আমি ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বলি, ছোড়দা, তুমি বড়দার মামাশ্বশুরের হয়ে নির্লজ্জ দালালি করতে এসেছো। বোধহয় কমিশনও পাবে। তবে জেনো রবি সর্বজ্ঞর সমালোচনা করার অধিকার একমাত্র রবি সর্বজ্ঞরই আছে। তুমি আমার সম্পর্কে ওসব বলার কে?

যাশুতোষ খুব হাসছিল। ধীরে ধীরে হাসির বেগটা কমে এলে বলল, কমিশন একটা আছে ঠিকই। লোকটা বেঁচে থাকলে রূপুর মনটা ভাল থাকবে।

রূপুটা আবার কে?

ওই লোকটার ছোট মেয়ে।

তার মন ভাল থাকলে তোমার কী?

রূপুর মন ভাল থাকলে আমি খুশি থাকি।

তার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক?

যাশুতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর তো হৃদয় নেই রবি, শুধু পেট আছে। হৃদয় থাকলে বুঝতিস।

তুমি কি রূপুকে ভালবাসতে?

বাসতাম। আমার মৃত্যুর অন্যতম কারণও ওই রূপু।

কেন ? সে কি তোমাকে রিফিউজ করেছিল ?

ঠিক তা নয়। রূপুর বাবা করেছিল।

তবু সেই লোকটাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও ?

আমার জন্য তো নয়, রূপুর জন্য। রূপু ওর বাবাকে বড় ভালবাসে।

আমি ভীষণ রেগে গিয়ে বলি, আর তোমার নিজের মায়ের পেটের ভাই যে কী ভালবাসে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যাথা নেই, না ছোড়দা ?

রাগছিস কেন ? আমি তো তোকে বড়দার মামাশ্বশুরের শরীরে ট্রানসফার করার ষড়যন্ত্র করিনি।

কিন্তু সমর্থন করছ। সেটাও যথেষ্ট খারাপ। ভাইয়ের চেয়ে কি প্রেমিকা বড় ?

যীশুতোষ আবার গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল। হাসিটা সামলে নিয়ে বলল, তোর কাছে অবশ্য প্রেমিকার চেয়েও কমার্স বড়। মনে নেই, সেই যে প্রিয়ার মন ছবি দেখতে গিয়েছিলি তুই আর রেশমী ! রেশমী যখন তোকে ভালবাসার কথা বলছে তখন তুই ছবিটা কেন ফ্লপ হল তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলি। রেশমীর একটা ডায়ালগেরও অর্থ তুই ধরতে পারিসনি।

আমি একটু লাল হয়ে বললাম, তাতেই বোঝা যায় প্রেম আমার বিবেক ও বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়নি।

তুই একটি নীরেট গাড়ল। সত্যিকারের প্রেমে পড়লে বুঝতিস, প্রেমিকার কাছে মা বাবা ভাই বোন সব তুচ্ছ। তখন প্রেমিকার বেড়ালটাকে পর্যন্ত ভাল লাগতে থাকে। এই আমার কথাই ধর না, আমি কোনওদিন বেড়াল দুচোক্ষে দেখতে পারি না। সেই আমিই রূপুর বেড়ালের জন্য কতদিন পকেটে করে মাছ নিয়ে গেছি। প্রেমে পড়লে সব করা যায়।

ছিঃ ছিঃ ছোড়দা তোমার লজ্জা করে না ?

এখন আমি লজ্জা টজ্জার অনেক উর্ধ্বে। তাই বলতে লজ্জা নেই, রূপুকে একটু খুশি রাখতে তুই যদি ওর বাবা হয়ে বেঁচে থাকিস তরে আমি খুশিই হবো।

ছেলেবেলায় যীশুতোষ খুব রোগাভোগা ছিল। পিঠোপিঠি বলে আমার সঙ্গে ওর প্রায়ই ঝগড়া ও মারপিট লেগে যেত। যীশুতোষই আমার হাতে মার খেত বেশী। সেই হারানো আক্রোশটা আমি আবার হঠাৎ ফিরে পেলাম। কিন্তু যীশুতোষকে মারার চেষ্টা করে লাভ নেই। বায়ুভূতকে কে মারতে পারে। আমি দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, ভেজা গা আর সর্দি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো একটা ঠুনকো প্রেমের জন্য ছোড়দা? তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

হাঃ হাঃ করে হাসল যীশুতোষ।

আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে তেড়ে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু কপাল খারাপ। যীশুতোষের গায়ের জলে ঘরের মেঝে ভিজে একশা। তাইতে পা হড়কে পড়ে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল।

চোখের অন্ধকার কেটে যখন আলো ফুটল তখন যীশুতোষ ঘরে নেই। কে একজন যেন আমার মাথার কাছে বসে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে আর বলছে, ভর হয়েছে গো। ভর হয়েছে। এ তো যে সে লোক নয়, সাক্ষাৎ মহাদেব। ভাঙ গাঁজা চরস মদ এনার কাছে নস্যি। নিজের চোখে যা দেখলুম। ওঃ!

আমি জানি আমি মহাপুরুষ নই। আমি রবি সর্বজ্ঞ। একজন অত্যন্ত অসফল ব্যর্থ ডিফেনসের খেলোয়াড়। আমার আশপাশ দিয়ে সর্বদাই বিপক্ষের খেলোয়াড়রা বল গোলে নিয়ে যায়। বস্তুত খেলা থেকে আমি বাদও হয়ে যাচ্ছি। আর মোটে একটা রাত্রি মাঝখানে। তারপর অন্য এক নাটক শুরু হবে। ভগন্দর, হাঁফানী, কাঁচা মুগ এবং থড়মের অরণ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে রবি সর্বজ্ঞ।

তবু আমি রাখালের দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। মাথাটা বিশমনী

পাথরের মতো ভার হয়ে আছে, জিব থেকে গলা অবধি শুকনো, চোখে আলো লাগতেই জ্বালা করছে, মন অবসন্ন, চিন্তাশক্তি স্তিমিত, শরীরে একরত্তি জোর নেই। একেই হ্যাংওভার বলে বোধহয়। আমি শুঁড়ির ছেলে, খোঁয়াড়ি ভাঙা কাকে বলে তা জানি। রাখালকে বললাম, আর একটু গলায় ঢেলে দাও।

আরো ? রাখালের হাঁ আর বন্ধ হয় না।

আমি বললাম, একটুখানি।

রাখাল তটস্থ হয়ে একটুখানি গেলাসে ঢেলে এনে দিল। বলল, সাধনা করলে তুমি খুব উঁচু থাকে উঠে যাবে ছোটোবাবু।

আমি দিনের আলোয় হাসিমুখে মদটা গলায় ঢেলে দিই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাল বোধ করতে থাকি। শুঁড়ির ছেলে হিসেবেই জানি, পেট পুরে ঠেসে খেয়ে নিলে হ্যাংওভার টপ করে কেটে যায়। রাখালকে হুকুম করি, রাতের খাবারগুলো গরম করে আনো।

হুকুমমাত্রই রাখাল ছোটাছুটি লাগিয়ে দেয়। খাবার গরম হয়ে আসে এবং আমি গোগ্রাসে গিলতে থাকি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আবার রোজকার নিরীহ ও গোবেচারা রবি সর্বজ্ঞে ফিরে আসি।

রাখাল আগাগোড়া সামনে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখে আর মাঝে মাঝে বলে, কাল যে স্বরূপ দেখলাম তোমার তাতেই চোখ খুলে গেছে। তোমাকে আমি আর ছাড়ছি না। উরেব্বাস, এরকম মাল কোনও মানুষ টানতে পারে !

একথা ঠিকই যে, রবি সর্বজ্ঞর সবটুকু আমি এখনো জানিনা। তার মধ্যে কিছু রহস্য হয়তো বা এখনো রয়ে গেছে। কাল রাতে আমি কতটা মদ খেয়েছিলাম তা আমি জানিনা। তবে শুঁড়ির ছেলে বলেই বোধহয় আমার রক্ত বহুকালের অবরুদ্ধ একটা শোধ তুলে নিয়েছে। আমার বংশে কেউ কখনো মদ খায়নি। সেটা মদের পক্ষে অপমানকর আচরণ। মদ তাই ওত পেতে ছিল। প্রথম সুযোগেই

বংশের যত লোকের যতটা বকেয়া ছিল তা মেটাতে আমার ভিতরে সেঁদিয়ে গিয়েছিল। কিংবা আসন্ন মৃত্যুর ভয় আমার নেশা কাটিয়ে দিয়েছিল। কিংবা ঠিক কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন এখন নেই। রাখাল যে আমাকে শ্রদ্ধা করছে সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার।

বেলা দশটা নাগাদ শুকনো মুখে লাটুবাবু এসে হাজির। স্বর খোনা হয়ে গেছে। বাঁ দিকের পাঁজর চেপে ধরে আমার বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে বললেন, কাল রাতে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল প্রায়।

আমি শশব্যস্তে বলি, তাই নাকি? তাহলে এই অবস্থায় আপনার বেরোনো ঠিক হয়নি।

সে তুমি ভালোমানুষের ছেলে বলে বলছ। কিন্তু মেয়ের মা তো ভালমানুষের বেটি নয়। সে বিধবা হতে রাজি, কিন্তু অমন সুপাত্র হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

আমি বললাম, হাতছাড়া তো হয়নি।

হয়নি বটে, কিন্তু যা চাইছে তা দিতে না পারলে হবে।

আমি মাথা চুলকে বলি, সে অবশ্য ঠিক।

লাটুবাবু আমার হাত ধরে বললেন, তুমি একটু দরাদরি করে দেখবে? কিছু যদি কমানো যায় তাহলে সেটাই লাভ। গয়না বেচে দিয়েছি, বাড়িও বেচে দিচ্ছি, কারবারও ছেড়ে দিচ্ছি পার্টনারকে। তবু বোধহয় কুলিয়ে উঠতে পারব না, কিছু ধার হয়ে যাবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিক আছে। দেখব।

এবং আমি দেখলামও।

দুপুরেই রুদ্রাক্ষর ঘরে হানা দিয়ে বললাম, শোনো রুদ্রাক্ষ, লীনাকে বিয়ে করার ব্যাপারে কিছু বাধা দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়তো হবে না।

রুদ্রাক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, সে কী সর্বজ্ঞ? তুমি কি আমাকে ডোবাতে চাও?

আমি স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেই এসেছি। পা নাচাতে নাচাতে বলি, হয়েছে কি জানো, সেই আমার চেনা মেয়েটির বাবা তোমার ডিম্যাণ্ড ফুলফিল করতে পারছেন না। তিনি এখন চাইছেন, আমিই মেয়েটিকে বিয়ে করি।

না, না বলে আর্তনাদ করে ওঠে রুদ্রাক্ষ, তা হয় না সর্বজ্ঞ। আমি যে মনে মনে সেই মেয়েটিকে নিজের স্ত্রী বলে ভাবতে শুরু করেছি। আচ্ছা, আমি কত ডিম্যাণ্ড করেছিলাম বলো তো?

নগদ সত্তর হাজার।

দেন, মেক ইট ফিফটি।

আমি নির্লিপ্ত মুখে বলি, ওর চেয়ে অনেক কমে আমি রাজি হয়েছি রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ তাড়াতাড়ি বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকে এবং কফির অর্ডার দেয়। তারপর নিজের মনে কী একটু হিসেব নিকেশ করে বলে, ফিফটি থাউজ্যাণ্ড ইজ ভেরি চীপ। তবে আমি বাবাকে বলে আরো কিছু কমাতে চেষ্টা করব। ধরো চল্লিশ টল্লিশ!

টু মাচ। আমি জুয়াড়ির মতো মুখ করে বলি, তার ওপর বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ডিম্যাণ্ডও আছে রুদ্রাক্ষ।

আছে নাকি? ঠিক আছে, ওটা কারটেল করছি। তাহলে হবে?

হতে পারে।

হতেই হবে ভাই। লীনাকে তুমিই বিয়ে করো।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, কিন্তু লীনার বাবা তো আমাকে পণ দেবেন না রুদ্রাক্ষ।

ওর বাবা না দিক আমি দেবো সর্বজ্ঞ। তোমার ডিম্যাণ্ড কত?

বিশ হাজার। হার্ড ক্যাশ।

অ্যাগ্রিড। বলে সে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে।

—আমি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলি, আমি অবশ্য বাড়ি বা ফ্ল্যাট চাই না। তবে সেদিন দেখছিলাম, লীনার গায়ে কোনো গয়না নেই।

অথচ শাস্ত্রে সালংকারা কন্যার কথাই আছে। গয়না ছাড়া কি বিয়ে হয়?

গয়না দিয়েই হবে সর্বজ্ঞ। কত ভরি হলে তোমার হয় বলো তো!

বিশ ভরির নীচে তো খারাপই দেখাবে। লীনা একজন বিগ বস-এর মেয়ে তো।

তাহলে বিশ ভরিরই ব্যবস্থা হবে সর্বজ্ঞ। জাস্ট কিপ হার আউট অফ মাই হেয়ার।

ঠিক আছে রুদ্রাক্ষ, তাই হবে। কিন্তু দেরী করা চলবে না।

তুমি কবে চাও?

কাল।

বলো কী? এত শীগগির!

আমার সময় নেই রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটু ভেবে নিয়ে বলে, ইট মে বি অ্যারেনজড।

আমি মাথা নেড়ে বলি, একটা নয় রুদ্রাক্ষ। দুটো। তোমারটাও অ্যারেনজ করো। কালই।

সর্বনাশ সর্বজ্ঞ। আমি এত তাডাতাড়ি পারব না।

পারবে। শুধু রেজিস্ট্রি, সামাজিক বিয়ে দুদিন পরে হলেও ক্ষতি নেই।

রুদ্রাক্ষ মাথা নীচু করে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বিষণ্ন মুখখানা তুলে বলে, তুমি প্রকৃত গাড়ল নও। শুধু সেজে থাকো। ঠিক আছে, তোমার মুখ চেয়ে আমি তাতেই রাজি। কাল বিকেল ছ'টায় এই অফিসঘরেই রেজিস্ট্রার হাজির থাকবে। তুমি মেয়েটিকে নিয়ে এসো।

কফি খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং টেলিফোনে লাটুবাবুকে খবরটা দিই।

লাটুবাবু ফোনেই চেঁচিয়ে ওঠেন, কী বললে? এই রে, ফোনটা বোধহয় আজও গড়বড় করছে।

লাটুবাবু এত জোরে চেঁচিয়েছিলেন যে ফোনটা আমি কান থেকে অনেকটা দূরে ধরে রেখে বলি, ফোন ঠিক আছে লাটুবাবু। রুদ্রাক্ষ চল্লিশে রাজি, তবে ওটা ত্রিশে নামবে। বাড়িও বাদ গেছে। রেজিস্ট্রি কাল।

তুমি কি পি সি সরকার? কী করে করলে?

সে কথা থাক লাটুবাবু। আপনি গয়না বিক্রি করবেন না ব্যবসাও ছেড়ে দেবেন না।

আমার বুকে যে এখন আবার নতুন করে চিড়িক শুরু হল রবি।

কমে যাবে।

খারাপ খবরেও স্ট্রোক হয়, আবার ভাল খবরেও স্ট্রোক হয়। কী যে করি!

স্ট্রোক হবে না, লাটুবাবু। ভাববেন না। কালই রেজিস্ট্রি, মনে রাখবেন।

॥ নয় ॥

রবি সর্বজ্ঞর জন্য মনটা আমার খারাপই লাগছিল। লোকটাকে আমি পছন্দ করিনা বটে, তবে তার এই পরিণতিও আমি চাইনি। তার সঙ্গে এই চিরবিচ্ছেদের প্রাক্কালে আমার মনে হচ্ছিল, লোকটা বোধহয় সর্বাংশেই খারাপ ছিল না। লোকটার ব্যক্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু সে নিরীহ ও নিরাপদ। এও সত্য যে, রবি সর্বজ্ঞকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেই ফেলা যায়, তবু লোকটা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মিথ্যেকথা বলতে চায় না। সে যে প্রগাঢ় গাড়ল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিকে দেখতে গেলে দেখা যায়, সে চুরি চামারি বা অন্যান্য অসৎ কাজ কমই করেছে। ঘুঁষ খাওয়ার সুযোগ পেলে সে ঘুঁষ খাবে কিনা তা এখনই বলা যায় না বটে, তবে সে আজ অবধি যে ঘুঁষ খায়নি সেটাও তো কম কথা নয়। এই পৃথিবীতে সে বহিরাগতের মতো ভয়ে ভয়ে বাস করে, পাত্রের বাজারে তার তেমন কোনও দাম নেই, মনুষ্য সমাজেও সে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবু একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়, বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর হওয়ার মতো তেমন বড় অপরাধও সে করেনি।

আজ জীবনের এই শেষ রাত্রে রবি সর্বজ্ঞর জন্য দুঃখে আমার চোখে জল এল। অবশ্য চোখে জল আসার আর একটা কারণও আছে। সেটা হল ধোঁয়া। ভিতরের উঠোনে কিছুক্ষণ আগেই যজ্ঞ শুরু হয়েছে! পোড়া ঘি এবং কাঠের ধোঁয়ায় ভরে গেছে সারা বাড়ি। সেই মারণযজ্ঞের ধোঁয়ায় শহীদেরও চোখে জল এসে গেছে। আমার পাশটিতে শুয়ে সে করুণ মিঁয়াও মিঁয়াও আওয়াজে নালিশ জানিয়ে যাচ্ছে।

উঠোনের দিকে একটা দরজা আছে এ ঘরে। বড়দা মহীতোষ অবশ্য কাঠের তক্তা মেরে দরজাটা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে অনেকদিন আগেই। তবু পুরোনো দরজার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে উঠোনটার অংশ বিশেষ নজরে পড়ে। আমি সেই ফাঁক-ফোঁকরে চোখ পেতে তান্ত্রিককে ভাল করে দেখে নিয়েছি। বাস্তবিকই অভিভূত হওয়ার মতো চেহারা। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। পরনে টকটকে রক্তাম্বর এবং প্রচুর দাঁড়ি গোঁফ ও লম্বা চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ সার্চলাইটের মতো জ্বলছে। একটা মড়ার খুলিতে চুমুক দিয়ে মাঝে মাঝে কারণ পান করে হুংকার দিচ্ছে, জয় মা! জয় মা!

শুদ্ধ বস্ত্রে সেজে বড়দা মহীতোষ ও বউদি যজ্ঞে কাঠ ও ঘি যোগান দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখেচোখে একটা তদগত ভাব।

বলতে নেই আয়োজন চমৎকার। রবি সর্বজ্ঞর মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোককে এরা যথেষ্টই গুরুত্ব দিচ্ছে। খাঁটি ঘি আনানো হয়েছে বিহার থেকে, কাঠ আনতে সুন্দরবনে লোক পাঠানো হয়েছিল, হাই গ্রেড এই তান্ত্রিকের ভিজিটও নিশ্চয়ই কম নয়। এই আয়োজন দেখে রবি সর্বজ্ঞর খুশিই হওয়ার কথা।

আজও বউদি বিরিয়ানি ও চমৎকার সব খাবার পাঠিয়েছিল। আগামীকাল থেকে শুধু কাঁচা মুগের ডাল দিয়ে ভাত মারতে হবে ভেবে আমার পেটটায় গোঁতলান দিচ্ছিল খিদেয়। আমি তাই আষ্টেপৃষ্ঠে খেয়ে নিয়েছি। রবি সর্বজ্ঞ হিসেবে এই তো আমার শেষ ভাল খাওয়া দাওয়া।

সারা রাত যজ্ঞ চলবে। বাণ মারা হবে কাল। মাঝখানে একটা রাত্রি মাত্র। এই রাত্রিটা সৌজন্যবশে রবি সর্বজ্ঞর জেগেই কাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওই প্রচুর সুখাদ্য পেটে যাওয়ায় কিছুতেই সে জেগে থাকতে পারছিল না। চোখের জল মুছতে মুছতে একধারে শহীদ ও অন্যধারে একটা ময়লা তেলচিটে পাশবালিশ নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। শিয়রে শমন কিংকর পরোয়ানা হাতে দাঁড়িয়ে. তব

যে রবি সর্বজ্ঞ ঘুমোতে পারল তাতেই প্রমাণ হয় সে কত বড় আহাম্মক।

সকালে ঘুম ভাঙতেই সে টের পেল, তীব্র এক বৈরাগ্যে তার মন ছেয়ে গেছে। এমন কি পৃথিবীর উপরিভাগটি কেউ যেন রাতারাতি গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে দিয়ে গেছে বলে তার মনে হতে লাগল।

রাখাল চমৎকার জলখাবার এনেছে সকালে। ডবল ডিমের পোচ, পুরু করে মাখন লাগানো রুটি, এক গেলাস ঘন দুধ। সেসব খাওয়ার সময় রবি সর্বজ্ঞর মনে হচ্ছিল, কাঁচা মুগের ডালও কিছু খারাপ লাগবে না তার কাছে। সম্ভবত একই রকম লাগবে।

রাখাল চুপি চুপি বলল, সারা রাত যজ্ঞ করে তান্ত্রিকবাবা এখন একটু জিরোচ্ছে। জিরিয়ে উঠে সন্ধেবেলা বাণ মারতে শুরু করবে। বউদির মামাও এসে গেছে। ওপরের দক্ষিণমুখো ঘরটায় শুয়ে কাশছে খুব।

অতিশয় নিরাসক্ত গলায় রবি বলল, তাই নাকি?

আসলে বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়ার পার্থক্যটুকু আজ ঘুচে গেছে রবির কাছে। রাস্তায় বেরিয়ে আজ সে সুন্দরী ও অসুন্দরী মহিলাদের পার্থক্য বুঝতে পারছিল না। শীত গ্রীষ্মের তফাৎ ধরতে পারছিল না। তবে পথে চাঁদসীর ক্ষত চিকিৎসালয়ের একটা দোকান দেখে সে ভিতরে ঢুকে বুড়োমতো একটা লোকের কাছে ভগন্দর ও হাঁপানির চিকিৎসা আছে কিনা জেনে নিল। জানা গেল, আছে। হোমিওপ্যাথের কাছেও গেল সে। অ্যালোপ্যাথের দোকানেও হানা দিল, বিস্তর ওষুধ কিনে ফেলল। চিৎপুরে গিয়ে সে নতুন খড়মেরও দর জেনে নিল। বেছেগুছে দামী দেখে একজোড়া খড়ম কিনল সে। তারপর ফিরে এল।

দুপুরে আবার এলাহী খাওয়ার আয়োজন। নির্বিকারভাবেই খেয়ে নিল রবি। তারপর বহুকাল বাদে বাড়ির নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকল সে। তবে আজ তার ভয় বলে কিছু নেই। সমুদ্রে শয়ন যার

শিশিরে কি ভয় তার। অবশ্য এমনিতেও ভয়ের কিছু ছিল না। বাড়িশুদ্ধ লোক আজ ঘুমোচ্ছে। নিঃশব্দে ওপরে উঠে দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ঢুকল রবি। নির্ভয়ে।

মস্ত খাটে কাকলাসের মতো এক বুড়ো শুয়ে আছে। গায়ের রঙ ঘোর কালো, হাড় জিরজিরে চেহারা, গাল তোবড়ানো, চক্ষু কোটরগত, মাথায় টাক। এমনিতে লোকটাকে পছন্দ হওয়ার কথা নয় রবির। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যের স্টিম রোলার এসে সব সমান করে দিয়ে গেছে। আজ তার চোখে বুড়োও যা, যুবাও তাই। ফর্সাও যা, কালোও তাই। মোটাও যা, রোগাও তাই।

বউদির মামা ঘুমোচ্ছিল। রবি নিঃশব্দে তার কাগজের মতো পাতলা খড়মজোড়া তুলে নিয়ে নতুন খড়মজোড়া স্থাপন করল সেখানে। টেবিলের ওপর ভগন্দরের ওষুধগুলোও সাজিয়ে রাখল সে। একটা শিশির নীচে চাপা দিয়ে রাখল লাটুবাবুর দেওয়া পাঁচশো টাকার শেষ চারশ। এ সবই কাজে লাগবে। লাটুবাবুকেও বলে দেবে সে, তার পাওনা টাকাগুলো যেন রূপুর বাবাকেই শোধ দিয়ে দেয়।

লোকটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রবি। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে লোকটাকে ধীরে ধীরে বেশ ভালই লাগতে লাগল তার। রংটা কালো, তাতে কী হয়েছে? কৃষ্ণাঙ্গরা তো দাপটের সঙ্গেই বেঁচে আছে পৃথিবীতে। রোগা? তাতে কি? বেশী চর্বি কি ভাল? বয়স? বেঁচে থাকলে কার না বয়স বাড়ে।

এসব ভেবে রবি লোকটাকে মনে মনে বাস্তবিকই ভালবেসে ফেলল। আজ জলদাপাড়ার অদেখা একটা গণ্ডারকেও ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব।

ধীরে ধীরে নেমে এল রবি। শহীদকে শেষবারের মতো একটু আদর করল সে। তিন দিন বাদে আজ দাড়ি কামাল। ভাল একটু সাজগোজ করল। বহুকাল আগে রেশমী বলেছিল, সে নাকি দেখতে

খারাপ নয়। নিজের চেহারা কেমন তা নিয়ে রবি গভীরভাবে ভেবে দেখেনি কখনো। ভাবার অবকাশ পায়নি। এত উদ্বেগ, সমস্যা, এত ছোটোবড় সংকট তাকে সবসময়ে আচ্ছন্ন করে রাখে যে চেহারার কথা তার মনেই পড়ে না। তবে আজ আয়নায় নিজের চেহারাটা ভাল করে দেখল রবি এবং মনে মনে বউদির মামার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। সে ফর্সা, স্বাস্থ্য মজবুত, মুখখানা পুরন্ত। তবু বউদির মামার সঙ্গে নিজের খুব একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হল না তার।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটি নাকি খুবই অনিশ্চিত ব্যাপার। তাই হবে। রবির বিয়ে আজ, মৃত্যুও আজ। কোনোটাই ভাল ঘটনা নয়। তবে সব ঘটনারই একটা ভাল এবং একটা খারাপ দিক থাকে। লীনাকে বিয়ে করার পরই আজ রবির মৃত্যু। জীবনে এই প্রথম বিধবা হবে লীনা। এটা কি ঘটনার ভাল দিক নয়?

হাতে বেশী সময় নেই। রবি বেরিয়ে একটা ট্যাকসি ধরল।

লাটুবাবু সামনের ঘরে অতি বিরসমুখে বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন, খুব বিয়ে ঠিক করেছো। ওদিকে রুদ্রাক্ষ তার বাবা মাকে বলে দিয়েছে তার কোন পছন্দের মেয়ে আছে, তাকেই বিয়ে করবে। এইমাত্র টেলিফোন করে ওঁরা জানালেন, মেয়ে দেখতে আসবেন না। এ নিশ্চয়ই সেই রাক্ষুসীটা, লীলা না কী যেন নাম! ভিতরে গিয়ে দেখ, কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

আমি প্রসন্ন হেসে বলি, ঘটনার দ্রুত গতি আপনার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে লাটুবাবু।

তার মানে?

রুদ্রাক্ষর তো জানার কথা নয় যে, যাকে তার বাপ মা আজ দেখতে আসবে তার সঙ্গেই আজ তার বিয়ে। সে ঝিলিককে অন্য মেয়ে বলে জানে। তার দিক থেকে সে ঠিক কাজই করেছে। পুরুষোচিত কাজ।

লাটুবাবু একটু থতমত খেয়ে যান। হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে

সেই হাঁ-টা না বুঝিয়েই হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলেন, তাই তো! আমার মাথায় ওটা একদম খেলেনি। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

আলবাৎ। ঝিলিক কি তৈরি আছে লাটুবাবু?

খুব তৈরি। একেবারে কনের সাজে। চোখের জলে খানিকটা মেক আপ ধুয়ে গেছে বোধহয়। পাউডারটুকু লাগাতে যা সময় লাগে। তুমি বরং মিষ্টিটিষ্টি খাও বসে। আমি দেখছি।

লাটুবাবু ভিতর বাড়িতে ঢুকলেন। একটু বাদে ঘোমটা দেওয়া ঝি এসে রূপোর থালায় দেদার মিষ্টি দিয়ে গেল। রূপোর গেলাসে সরবৎও।

লাটুবাবু ফিরে এসে বললেন, আর পাঁচ মিনিট।

আপনিও সঙ্গে চলুন লাটুবাবু।

আমি! লাটুবাবু আকাশ থেকে পড়ে বলেন, আমি কেন এর মধ্যে? ছেলে ছোকরাদের সব ব্যাপার। আমরা সাবেকী মানুষ। ওসব রেজিস্ট্রি ফেজিস্ট্রির মধ্যে আবার আমাকে টানছ কেন?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলভরা তালশাঁস সন্দেশটা শেষ করে বললাম, ঝিলিককে ফেরৎ আনবে কে?

কেন তুমি!

আমি যে ফিরব না লাটুবাবু। অন্য একটা প্রোগ্রাম আছে।

কিসের প্রোগ্রাম?

নিমতলা শ্মশানঘাটে গিয়ে বসে থাকব।

বলো কী অলক্ষুণে কথা! ওসব জায়গায় যাবে কেন?

একটু এগিয়ে থাকার জন্য লাটুবাবু।

কী যে সব বলো না! তোমার মাথাটাই ইদানীং গেছে। শ্মশান মশান কি তোমার জায়গা?

আমি আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা ম্যাগনাম সাইজের ক্ষীর চমচম শেষ করে ফেলি। সব কিছুতেই আমি আজ কাঁচা। মুগডালের

এক অবিনশ্বর স্বাদ পাচ্ছি। চমচমের পর রাবড়ির বাটিতে চুমুক দিয়ে দেখি, অবিকল সেই স্বাদ। মুখ নীচু করে খেতে খেতে ঝকঝকে রূপোর থালায় আমি নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। অবিকল মহীতোষের মামাশ্বশুরের মুখ।

হঠাৎ কেমনধারা ঘরের আলোটা বদলে গেল! রোদের একটা ক্ষীণ আভা ছিল ঘরে। সেটা কেমন গোলাপী রং ধরল। ঘরের গন্ধটাও হঠাৎ পাগল হয়ে উঠল কেন; ঠিক বটে আজ রজনীগন্ধা এবং গোলাপজলে ঘরের চেহারা এবং আবহ ফেরানো হয়েছে। তবু এ গন্ধ তো রজনীগন্ধা বা গোলাপজল থেকে আসছে না! কেমন যেন একটু মৃদু সংগীত বেজে উঠল না নেপথ্যে?

ধীরে ধীরে আমি মুখ তুললাম। আমার চোখ আর এক জোড়া বিশাল চোখের জালে আটকে গেল।

আর ঠিক সেই সময়েই রাসকেল তান্ত্রিকটা বোধহয় প্রথম বাণটা ছুঁড়ল।

থালাটা ঝন্‌ঝন্ করে পড়ে গেল হাত থেকে। দুহাতে আমি আমার ব্যথিয়ে ওঠা বাঁ বুক চেপে ধরে ককিয়ে উঠলাম। তারপর আমার শরীরটা অবশ হয়ে ঢলে পড়তে লাগল সোফার ওপর।

কী হল কী হল? বলে দৌড়ে এসে লাটুবাবু আমাকে ধরলেন, ও রবি, কী হল তোমার?

আমি অস্ফুষ্ট স্বরে বললাম, বাণ। তান্ত্রিকের বাণ লাটুবাবু।

কিন্তু বলতে বলতেও আমি বুঝতে পারছিলাম, হয়তো ভুল করছি। এটা হয়তো তান্ত্রিকের বাণ নয়।

লাটুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, ওরে ঝিলিক! হাঁ করে দেখছিস কী? শীগগির বাতাস কর। জলের ঝাপটা দে।

চোখটা আমি ভয়ে ভয়ে বুজেই রাখলাম। ওই রূপ আবার দেখলে হয়তো আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে হবে, বৈরাগ্যটা পালিয়ে যাবে ফুরুৎ করে, এবং মহীতোষের মামাশ্বশুর হতে আবার অনিচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে

উঠবে। তবে চোখ বুজেই আমি টের পাচ্ছিলাম, ঝিলিক খুব নরম করে একটু জলের ছিটে দিল আমার চোখে। একটু হাওয়া করল। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল, আপনার কিছু হয়নি। এবার উঠে পড়ুন তো। বাবা কিন্তু ডাক্তার আনতে গেছে।

কী অদ্ভুত গাঢ় স্বর।

ধীরে ধীরে আমি চোখ মেলে চাই।

ঝিলিক মৃদু একটু হেসে বলে, আর ঢং করতে হবে না।

আমি তার অপরূপ মুখখানার দিকে, কাক যেমন পাকা বেলের দিকে চায়, ঠিক তেমনিভাবে চেয়ে থেকে ক্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করি, তার মানে?

আপনার কিছু হয়নি।

কী করে বুঝলেন?

আপনি ইচ্ছে করে ওরকম করেছেন।

মোটেই নয়।

কলকাতার ছেলেরা ভীষণ ফাজিল হয়।

আমি ফাজিল নই।

আপনি ভীষণ ফাজিল।

কী করে বুঝলেন?

আমি আর মা পর্দার আড়াল থেকে রোজ আপনার সঙ্গে বাবার কথাবার্তা শুনি। মাও বলে, রবি ভীষণ ফাজিল।

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন আমি তো লাটুবাবুর সঙ্গে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলি।

সেইটেই তো ফাজিলের লক্ষণ। আসলে বাবাকে আপনি মোটেই শ্রদ্ধা করেন না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আর কথাটাও তো মিথ্যে নয়। হয়তো বাস্তবিকই লাটুবাবুকে যতটা শ্রদ্ধা করা উচিত ততটা আমি এতদিন করিনি। কিন্তু ঝিলিককে

দেখার পর থেকে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা আসছে। যিনি এরকম একজন সুন্দরী মেয়ের জনক তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র।

ভিতরদিককার দরজার ভারী পর্দাটা সরিয়ে বয়স্কা এক মহিলা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। ধরা গলায় বললেন, তোমার বড় কষ্ট বাবা। আমরা সবই জানি। কত বড়লোকের ছেলে তুমি। আজ পথের ভিখিরি হয়ে গেছ। ওঁকে কত বলি, ওগো, রবির টাকাটা দিয়ে দাও, আমরা নয় শাকভাত নুনভাত খাবো। কিন্তু উনি ওইরকম। চোর ছ্যাঁচড় নন, কিন্তু সবকিছুই করবেন রয়ে বসে। আর এদিকে এই হীরের টুকরো ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে। আহা বাবা, আজ বুঝি কিছু খাওনি। কেমন গোগ্রাসে মিষ্টিগুলো খাচ্ছিলে।

আমি এই সামান্য আদরের কথায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ভেজা গলায় বললাম, না মাসীমা, আজ আমি শেষ খাওয়া খেয়ে নিচ্ছি।

ছিঃ বাবা, ও কী কথা? ও মোক্ষদা, রবিকে আর একটা মিষ্টির থালা এনে দে।

কিন্তু চোখের সামনে যে লক্ষ ভোলটের বিদ্যুৎশিখা দাঁড়িয়ে আছে তাকে কয়েক পলক দেখেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। সকালে আমার দৃষ্টিতে যে সাম্যভাবটি এসেছিল সেটি উবে গেছে। আশ্চর্যের কথা, আমার আর মহীতোষের মামাশ্বশুর হতেও ইচ্ছে করছে না। তড়িৎপৃষ্ট আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, আমি আর খেতে পারব না।

ও কী কথা! না খেলেই আমি ছাড়ব নাকি? সেদিন উনি এসে বলেছিলেন, তোমার বড় ভাই নাকি ষড়যন্ত্র করে বাড়ির ভাগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছে। তারপর নাকি কোন জ্যোতিষ তোমাকে বলেছে, আয়ু নেই। এইসব কথা আমি আর ঝিলিক রোজ বলাবলি করি। তোমার জন্য বড় কষ্ট হয়। পর্দার আড়াল থেকে রোজ তোমার গোপাল-গোপাল মুখখানা দেখে যাই আর ভাবি, কেন ভগবান এই সুন্দর ছেলেটাকে এত কষ্ট দিচ্ছে।

আমি আরো ভেজা গলায় বলি, কষ্ট কিসের মাসীমা? আরো কত লোক আমার চেয়েও কষ্টে বেঁচে আছে।

উনি বললেন, তাদের কথা ছাড়ো। আমি তোমার কথা নিয়েই ভাবি। শুনলুম তুমি নাকি ঝিলিকের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজে একটা গেছো মেয়েছেলেকে বিয়ে করছো।

আমি অধোবদনে বলি, হ্যাঁ মাসীমা। এছাড়া রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে দেওয়ার উপায় নেই।

ঝিলিকের রিনরিনে গলায় একটা ঝংকার দেয়, তা বলে যাকে তাকে বিয়ে করবেন? সে তো শুনেছি তিনবার ডিভোর্স করেছে।

আমাকেও করবে। কথা হয়ে আছে।

এমা! ছিঃ ছিঃ। আমরা তো একবারের কথাও ভাবতে পারি না।

'আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর কেউ না জানুক আমি জানি, লীনাকে একটিমাত্র দিনের জন্যও বিয়ে করার কোনো আগ্রহ আমার নেই। জীবনটা যাদের আত্মরক্ষার কাজেই কেটে যায় তারা পৃথিবীতে কোনো ঘটনাই ঘটাতে পারে না, তারা কেবল নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে মাত্র। লীনার সঙ্গে আমার আশু বিয়েটাও তাই।

ঝিলিক সমবেদনার সঙ্গে বলল, বাবা আসুক। আজ আমি বাবাকে খুব বকে দেবো।

লাটুবাবুর দোষ নেই।

লাটুবাবুর স্ত্রী বললেন, ওঁরই দোষ। কী এমন পাত্র যে, তার জন্য হামলে পড়তে হবে? ওসব বড় চাকরিওলা বড়লোকের ছেলেদের অনেক দোষও থাকে।

আছেও। আমি উৎসাহ পেয়ে বলে ফেলি।

মিসেস লাটু সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলেন, ওই ছ্যাখ ঝিলু, রবি কী বলছে! আছে। আমি তোকে আগেই বলেছিলুম না! তা বাবা, কী দোষ বলো তো!

আমি স্বীকারোক্তিটা প্রত্যাহার করার জন্য বারকয়েক ঢোঁক গিলে বললাম, সে সকলেরই থাকে। ও কিছু নয়।

নিশ্চয়ই মদ-মেয়েমানুষের দোষ। আসুন উনি, মজাটা দেখাব। সব বুঝে শুনেও কেউ এমন পাত্রের হাতে মেয়ে দেয়? আমি তো বাবা, পই-পই করে ওঁকে বলেছি, আর কিছু নয়, চরিত্রটা কেমন সেটা দেখো। আমি বড় ঘর, বড় চাকরির ছেলে চাই না। তা উনি এই ছেলের জন্যই পাগল। এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে নাকি সমাজের ওপরতলায় ওঠা যাবে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, পাত্র হিসেবে রুদ্রাক্ষ ভালই মাসীমা। আজ ঝিলিকের বিয়ের দিন। এই দিনে পাত্র সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

শ্রীযুক্তা লাটু উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, কী জানি বাবা, আমি তেমন ভাল বুঝছি না। আমি তো অন্য একটা কথা ভেবে রেখেছিলুম। ও ঝিলু, সেই কথাটা রবিকে বলব?

ঝিলিক ঈষৎ রক্তিম হল। মৃদু স্বরে বলল, থাক মা। বলে তো লাভ নেই।

কিন্তু মিসেস লাটু সরল সোজা মানুষ আমার দিকে অকপটে চেয়ে অকপট গলায় বললেন, আমরা ভেবেছিলুম কী জানো? এই তোমার মতো গোপাল-গোপাল চেহারার ভালমানুষ একটি ছেলে যদি পাই তবে ওর সঙ্গেই—

সেই রাসকেল বেরসিক তান্ত্রিকটা বোধহয় দ্বিতীয় বাণটা মারল এ সময়ে। মোক্ষদা দ্বিতীয় রূপোর থালা আমার হাতে সদ্য ধরিয়ে দিয়েছে। থালাভরা মিষ্টির দিকে চেয়ে আমার চোখে জল আসছিল। ঠিক এই অসময়ে বাণটা লাগল এসে বাঁ বুকে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম আমি। থালাটা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সেটা রেখে দু হাতে বুক চেপে ধরে আমি ককিয়ে উঠলাম। একটা আর্তনাদ

আমার গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, তা হয় না মাসীমা। তা হয় না। রুদ্রাক্ষ অপেক্ষা করছে।

ঝিলিক আর একটা ঝংকার দিল। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের এক ওলটপালট ঘটিয়ে, পৃথিবীর রং বদলে, ঝড় তুলে সে ছোট্ট করে বলল—করুকগে।